Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুমিনের গুন ও মর্যাদা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুরাইয়া ইয়াছমিন

রোলঃ 227021468

২৯ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুমিনের গুন ও মর্যাদা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

Through Knowledge towards Jannah

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুরাইয়া ইয়াছমিন
রোলঃ 227021468

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মুমিনের গুন ও মর্যাদা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুরাইয়া ইয়াছমিন, আইডিঃ 227021468 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মুমিনের গুন ও মর্যাদা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

সুরাইয়া ইয়াছমিন

(স্বাক্ষর)

সুরাইয়া ইয়াছমিন

আইডিঃ 227021468

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

মুমিন

মুমিন একটি আরবি শব্দ, যা মূলত আরবি ঈমান শব্দটি থেকে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ "বিশ্বাসী" এবং এর দ্বারা একজন কঠোরভাবে অনুগত মুসলিমকে বুঝায়,যে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ইসলামকে নিজের অভ্যন্তরের এবং বাহিরের সকল কর্মকান্ডে ধারণ করে এবং আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিজেকে পূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে।নারীদের ক্ষেত্রে মুমিনা শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

কুরআনে মুমিনের পরিচয় বলা হয়েছেঃ-

ذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يومنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون.اولأك علي هدي من ربهم واولأك هم المفلحون-

তথ্যসূত্র উইকিপিডি

সূরা মুমিনূন : সফল মুমিনের কয়েকটি গুণ

উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে কুরআনের রয়েছে বহু শৈলী। কখনো আদেশ-নিষেধের সুরে, কখনো পূর্ববর্তী উম্মতের ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে, কখনো জান্নাতের সুখ-শান্তি ও জাহান্নামের শাস্তির বর্ণনা দিয়ে, কখনো সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন নিআমতের কথা উল্লেখ করে। এছাড়াও আরও বিভিন্ন শৈলীতে কুরআনে কারীমে উপদেশ পেশ করা হয়েছে। প্রতিটি শৈলীরই রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও আবেদন।

এই শৈলীগুলোর একটি হল, মুমিনদের বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা। উদ্দেশ্য হল, মুমিনগণ যেন এসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়; ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে এগুলোকে গ্রহণ করে।

সূরা মুমিনূনের শুরুতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুমিনের এমনই কিছু বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْن وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْن وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْن وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْن اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْن فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْن وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰعُوْن وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْن اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْن.َ

নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছে মুমিনরা; যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত। যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। যারা যাকাত সম্পাদনকারী। যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে; নিজেদের স্ত্রী ও মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে, কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। তবে কেউ এছাড়া অন্য কিছু কামনা করলে তারাই হবে সীমালঙ্ঘনকারী। এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। এবং যারা নিজেদের নামাযের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে। এরাই হল সেই ওয়ারিশ, যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের মীরাস লাভ করবে। তারা তাতে সর্বদা থাকবে।
-সূরা মুমিনূন (২৩) : ১-১১

সুনানে কুবরা নাসায়ীর একটি হাদীসে এসেছে, ইয়াযিদ বিন বাবনুস রাহ. বলেন, একদা আমরা হযরত আয়েশা রা.-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, হে উম্মুল মুমিনীন! কেমন ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আখলাক?

তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক হল কুরআন। এরপর তিনি قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْن থেকে وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْن পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন এবং বলেন, এমনই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক।
-সুনানে কুবরা, নাসায়ী ১১২৮৭

উল্লেখিত আয়াতগুলোতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুমিনের সাতটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন :

এক : الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْن

যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত।

প্রথম বৈশিষ্ট্য হল, মুমিন নামাযে ‘খুশু’ অবলম্বন করে। নামায ঈমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। মুমিনের চক্ষু-শীতলতা। আল্লাহর নৈকট্য লাভের অনেক বড় একটি মাধ্যম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ.

নামাযে রাখা হয়েছে আমার চোখের শীতলতা। -সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৩৯৪০

অন্য হাদীসে এসেছে-

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ.

সিজদারত অবস্থায় বান্দা তার রবের সবচেয়ে বেশি নিকটবতীর্ হয়। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৮২

তবে নামাযের মিষ্টতা এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের অনুভূতি তখনই উপলব্ধি হবে, যখন নামায 'খুশু' এর সাথে আদায় করা হবে। আয়াতে শুধু নামায পড়ার কথা বলা হয়নি; বরং 'খুশু'-এর সাথে নামায আদায়ের কথা বলা হয়েছে। 'খুশু'-এর অর্থ হল, বিনয়ের সাথে অন্তরকে আল্লাহর অভিমুখী করা। -তাফসীরে কাবীর ২৩ : ২৫৯

নামাযে ইচ্ছাকৃত অন্তরে অন্য কোনো খেয়াল না আনা। অন্য কোনো খেয়াল এসে গেলে সাথে সাথে মন নামাযের অভিমুখী করা। 'খুশু' হাছিলের একটা সহজ পদ্ধতি হল নামাযে যা পড়া হয় তার দিকে ধ্যান রাখা। অর্থ জানা থাকলে অর্থের দিকে খেয়াল করা। দিলের মধ্যে এই অনুভূতি রাখা যে, আমি সর্বক্ষমতাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি আমাকে দেখছেন।

'খুশু' এর অপরিহার্য দাবি হল, নিজের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও স্থির রাখা। (প্রাগুক্ত) যেটাকে আমরা 'খুযু' বলে থাকি। এর সারকথা হল, নামাযের মধ্যে প্রতিটি অঙ্গ সুন্নাহসম্মত পন্থায় রাখা। এজন্য প্রত্যেকের জন্য জরুরি হল, নামাযে কোন্ অবস্থায় কোন্ অঙ্গ কীভাবে রাখতে হয় তার সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা।

দুই :

وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْن ۝

যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে।

মুমিনের বিশেষ একটি গুণ হল সে لغو থেকে বেঁচে থাকে। হাদীছ শরীফে এসেছে-

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيه.

সুন্দর মুসলিম হওয়ার একটি নিদর্শন হল, অর্থহীন কাজ ত্যাগ করা। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩১৮

অহেতুক বিষয় (لغو) থেকে বেঁচে থাকার সর্বপ্রথম ক্ষেত্র হল, সকল প্রকার গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকা। তেমনিভাবে এমন কথা, কাজ, লেখা ও চিন্তা থেকে বেঁচে থাকা, যাতে না দ্বীনী কোনো ফায়েদা আছে, না দুনিয়াবী কোনো ফায়েদা আছে।

অহেতুক বিষয় (لغو) থেকে বেঁচে থাকার একটি প্রায়োগিক দিক হল, কোনো বেহুদা ও অহেতুক আচরণ বা কথার সম্মুখীন হলে প্রতিউত্তর না দেওয়া, এড়িয়ে চলা। এ প্রসঙ্গে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ اِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا.

তারা (রহমানের বান্দারা) যখন বেহুদা কার্যকলাপের পাশ দিয়ে যায় তখন আত্মসম্মান বাঁচিয়ে যায়। -সূরা ফুরকান (২৫) : ৭২

তিন :

الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْن

যারা যাকাত সম্পাদনকারী।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, মুমিন যাকাত আদায় করে। যাকাত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয বিধান। হাদীসের ভাষায় ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি। তাই ঈমানের অপরিহার্য দাবি, যাকাত ফরয হলে যাকাত আদায় করা। যাকাত আদায় না করার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কঠিন হুঁশিয়ারি এসেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُون.

যারা সোনা-রুপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তির 'সুসংবাদ' দাও। যেদিন সে ধন-সম্পদ জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, তারপর তা দ্বারা তাদের কপাল, পাঁজর ও পিঠে দাগ দেয়া হবে (এবং বলা হবে) এই হচ্ছে সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে, তা মজা করে ভোগ কর। -সূরা তাওবা (৯) : ৩৪-৩৫

বুখারী শরীফের এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - ثُمّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ، ثُمّ تَلاَ: لَا يَحْسبَنّ الّذِينَ يَبْخَلُون الآيَةَ

যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন সেই সম্পদকে বিষাক্ত সাপের আকৃতি দিয়ে তার গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পার্শ্ব কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত মাল। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করেন-

وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَاۤ اٰتٰىهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ لِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْر.

[আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন কিছুতেই মনে না করে- এটা তাদের জন্য ভালো কিছু; বরং এটা তাদের পক্ষে অতি মন্দ। যে সম্পদে তারা কৃপণতা করে, কিয়ামতের দিন তা তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে দেওয়া হবে। আকাশ ও পৃথিবীর

মিরাছ কেবল আল্লাহরই জন্য। তোমরা যা-কিছুই কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। -সূরা আলে ইমরান (৩) ১৮০] -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৪০৩

চার :

وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ

যারা নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল, মুমিন তার লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। নিজের চাহিদা পূরণের জন্য সে কোনো অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে না। নিজের স্ত্রী ও শরীয়তসম্মত দাসী ছাড়া অন্য কারো সাথে তার চাহিদা পূরণ করে না। এ প্রসঙ্গে আরও ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْن وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُن.

মুমিন পুরুষদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য শুদ্ধতর। তারা যা কিছু করে আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত। এবং মুমিন নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফজত করে। -সূরা নূর (২৪) : ৩০-৩১

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ.

যে আমাকে তার দুই চোয়ালের মাঝের অঙ্গ অর্থাৎ, যবান এবং দুই পায়ের মাঝের অঙ্গের (সঠিক ব্যবহারের) যামানত দেবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হব। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৪৭৪

পাঁচ ও ছয় : وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰعُوْن.

এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।

এই আয়াতে মুমিনের দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে :

এক. মুমিন আমানতের হেফাযত করে। আমানতের হেফাযত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। ইসলামে ‘আমানতের হেফাযত’ কথাটার মধ্যে যে ব্যাপকতা রয়েছে এবং এক্ষেত্রে মুসলমানদের যে ইতিহাস সংরক্ষিত আছে তা ইসলামের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। হিজরতের প্রসিদ্ধ ঘটনা অনেকেরই জানা আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই কঠিন মুহূর্তেও নিজের কাছে গচ্ছিত আমানত আদায়ের জন্য হযরত আলী রা.-কে মক্কায় রেখে যান। (দ্র. সুনানে কুবরা, বায়হাকী ৬/২৮৯)

কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় আমানত হেফাযতের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

اِنَّ اللهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার হকদারকে আদায় করে দিবে। -সূরা নিসা (৪) : ৫৮

আমানতের খেয়ানতকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফিকের আলামত বলেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

মুনাফিকের আলামত তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ওয়াদা ভঙ্গ করে, তার কাছে কোনো কিছু আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৯

'আমানত' বলতে আমরা সাধারণত বুঝি, কারো কাছে কোনো কিছু সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে গচ্ছিত রাখা। এটাও আমানত এবং এর খেয়ানত অনেক বড় গুনাহ। তবে কুরআন-হাদীসে উল্লেখিত 'আমানত' শব্দ আরো অনেক বিষয়কে ধারণ করে। যেমন, আমাদের মেধা, যোগ্যতা, আমাদের সময়, আমাদের জীবন, মোটকথা আমরা যেসকল নিআমত ভোগ করি এসবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে আমানত। কিয়ামতের দিন এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। হাদীসে এসেছে-

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ.

কিয়ামতের দিন কোনো বান্দার পা নড়বে না, যতক্ষণ না তাকে জিজ্ঞেস করা হবে তার জীবন সম্পর্কে- কী কাজে তা ব্যয় করেছে। তার ইলম সম্পের্ক- তদনুযায়ী কী আমল করেছে। তার সম্পদ সম্পর্কে- কোথা থেকে তা অর্জন করেছে এবং কোথায় খরচ করেছে। এবং তার শরীর সম্পর্কে- কোন্ কাজে সে তা ক্ষয় করেছে। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৪১৭

তেমনিভাবে আমাদের পারস্পরিক প্রার্থিত রায় ও পরামর্শ, গোপন কথাবার্তা, অর্পিত দায়দায়িত্ব এসব কিছুও আমানতের অন্তভুর্ক্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

المُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ.

যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় সে আমানতদার। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৮২২

অন্যত্র ইরশাদ করেন-

إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الحَدِيثَ ثُمَّ التَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ.

যদি কেও কোনো কথা বলার সময় (গোপনীয়তা রক্ষার উদ্দেশ্যে) এদিক সেদিক তাকায় (অথবা কথাটি বলে প্রস্থান করে।) তাহলে তার কথা আমানত বলে গণ্য হবে। -জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯৫৯

আরেক হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। জনগণের শাসক তাদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। পরিবারের কর্তা তার পরিবার পরিজনদের দায়িত্বশীল সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার পরিবার বিষয়ে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। খাদেম তার মনিবের সম্পদের বিষয়ে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২৫৫৮

দুই. মুমিনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, সে কৃত আহ্দ বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। এটিও ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

وَ اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا.

আর অঙ্গীকার পূরণ করো। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। -সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৩৪

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন-

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ.

হে মুমিনগণ তোমরা অঙ্গীকার পূরণ করো। -সূরা মায়িদা (৫) : ১

কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত 'আহ্দ' শব্দের ব্যাপক অর্থে অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত। আমাদের পারস্পরিক চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি এই 'আহ্দ'-এর অন্তর্ভুক্ত। এটা দুই ব্যক্তির মধ্যে হতে পারে, কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে হতে পারে অথবা কোনো রাষ্ট্রের সাথেও হতে পারে।

একে অপরকে যে ওয়াদা দেয়া হয় সেটাও এই 'আহ্দ'-এর অন্তর্ভুক্ত। মুমিনের পুরো জীবনটাই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটা 'আহ্দ'-এর সবচেয়ে বড় এবং সর্বপ্রথম ক্ষেত্র। কালেমার মাধ্যমে সে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, আল্লাহ তার মাবুদ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পদ্ধতিতে সে তার জীবন পরিচালিত করবে।

এটা হল একজন মুমিনের জীবনের সবচেয়ে বড় 'আহ্দ' বা প্রতিশ্রুতি, যা পূরণ করা একজন মুমিনের জন্য প্রথম ফরয। অন্যান্য সকল চুক্তি, প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদা এই 'আহদ'-এর অধীন।

সাত :

وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ

যারা নিজেদের নামাযের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে।

সপ্তম বৈশিষ্ট্য হল, মুমিন নামাযের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে। 'নামাযের রক্ষণাবেক্ষণ করে' কথাটা ব্যাপক। এর মধ্যে অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত। যেমন, পাবন্দির সাথে নামায আদায় করা, কখনো পড়বে কখনো পড়বে না-এমন নয়। সময়মতো নামায আদায় করা। জামাতের সাথে আদায় করা। নামাযের অন্য সকল শর্ত, আদাব ও নিয়ামাবলি রক্ষা করে সুন্দর ও সুচারুরূপে আদায় করা। (দ্র. তাফসীরে কাবীর ২৩/২৬৩)

এর জন্য জরুরি হল নামাযের এসকল শর্ত ও আদাব সম্পর্কে ইলম হাছিল করা।

এই সাতটি বৈশিষ্ট্য যাদের মধ্যে থাকবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁদের ব্যাপারে সফলতার ঘোষণা দিচ্ছেন এবং সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তাঁরা জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ করবে। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

লক্ষণীয় বিষয় হল, এই সাতটি বৈশিষ্ট্যের প্রথম ও শেষ উভয়টিই নামাযের সাথে সম্পৃক্ত। এর দ্বারা বুঝা যায় মুমিনের যিন্দেগীর সফলতার জন্য নামাযের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

আল্লাহ আমাদের সকলকে এই সব বৈশিষ্ট্য অর্জনের তাওফীক দান করুন এবং আপন ফযল ও করমে জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরসূরি বানিয়ে দিন- আমীন।

https://www.alkawsar.com/bn/article/2882/

মুমিন অদৃশ্য বিশ্বাসে হবে

অদৃশ্য ঈমান আনয়ন যা দেখা যায় না, শোনা যায় না,এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা অনুভব করা যায় না ,এমন বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা বা বিশ্বাস করা।যেমন আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী, ওহী ফেরেশতা, আখেরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি।এ সত্যগুলোকে না দেখে বিশ্বাস করা এবং প্রদত্ত খবরের উপর আস্থা রেখে এগুলোকে মেনে নেওয়াই হচ্ছে ঈমান বিলগায়েব বা অদৃশ্য বিশ্বাস।

আল কুরআন থেকে কেবল তারাই হেদায়েত লাভ করবে যারা অদৃশ্যমান বিষয়গুলোর ব্যাপারে মুমিন হবে।আর যদি কেউ এমন চিন্তা করে যে, না দেখে না বুঝে, পরিমাণ বা ওজন না করে,ইন্দ্রিয় দ্বারা স্বাদ-অস্বাদন না নিয়ে তোমার মন মত কোন জিনিস আমি মেনে নিতে পারি না,তাহলে সে কুরআন থেকে হেদায়েত লাভ করতে সক্ষম হবে না,অদৃশ্য বিশ্বাস-অবিশ্বাস একটি পরীক্ষার মাধ্যম।আর এ পরীক্ষার মেয়াদ গায়েবের পর্দা উন্মোচিত হওয়া পর্যন্ত।গায়েবের পর্দা উন্মোচিত হলে সংশোধনের অবকাশ শেষ হয়ে যায়।আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন-

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ

“তারা বলে, এ নবীর কাছে কোন ফেরেশতা পাঠানো হয় না কেন?যদি ফেরেশতা পাঠাতাম ,তাহলে এতদিনে কবেই ফায়সালা হয়ে যেত,তখন আর তাদের অবকাশ দেওয়া হতো না।”(সূরা আল আনআম: ৮)

অর্থাৎ ঈমান আনার ও নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করার জন্য তোমরা যে সময়-সীমা ও অবকাশ লাভ করেছ এর সময়-সীমা ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ সত্য অদৃশ্য রয়েছে।নয়তো অদৃশ্যর পর্দা ছিন্ন হবার সাথে সাথেই এ অবকাশের সুযোগ শেষ হয়ে যাবে।একজন মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে এক্ষেত্রে কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় ও প্রশ্ন ছাড়াই এ অদৃশ্য সত্যগুলোকে সত্য বলে অনায়াসেই মেনে নিবে এবং শুধু নিজেই বিশ্বাস করে ক্ষান্ত হবে না বরং অন্যকেও কেউ বিশ্বাস করতে উপদেশ দিবে।শুধু তাই নয় কাউকে অস্বীকার করতে দেখলে সে প্রতিবাদী হয়ে উঠবে।

কেননা আল্লাহ তাআলা অদৃশ্যে (عيب)বিশ্বাসীদেরকেই মুমিন বলে সার্টিফাই করেছেন অর্থাৎ যারা অদৃশ্যে বিশ্বাসী হবে, তারাই কেবল মুমিন বলে বিবেচিত হবে।আল্লাহ তায়ালা বলেন -

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ –

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ–

“এটি এমন একটি কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। হেদায়েত সে মুত্তাকীদের জন্য যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে”। (সূরা আল বাকারা : ২-৩)

মুমিন হওয়ার জন্য প্রথম শর্তই হলো তার মধ্যে মুমিন হতে হবে এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোন সংশয় থাকতে পারবে না । কেননা পৃথিবীতে মানুষের পরীক্ষা কেবলমাত্র একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে চলছে ।আর সেটি হলো সত্যকে না দেখে সে তাকে মানতে প্রস্তুত কিনা ?এবং সত্যকে অমান্য করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকা সত্তেও স্বেচ্ছায় তার অনুগত্য

করার মতো তার নৈতিক শক্তি আছে কি-না?যেমন মূসা(আ.)বিশাল সাপ দেখে দৌড় দিলেন আর আল্লাহ তায়ালা বললেন মুসা ভয় পেয়েও না সাপটি ধর। মূসা (আ.) একটুও দেরি করলেন না আল্লাহ তায়ালা বলার সাথে সাথে সাপ ধরে ফেললেন। এর নাম হল মুমিন ।

মুমিন সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে

মুমিন তার অন্তরে সার্বক্ষণিক আল্লাহ তা'আলার ভয় লালন করে। এই জন্য শয়তান তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। মুমিন সে আল্লাহর উপর এমন আস্থাশীল থাকে যে, কোন বিপদও তাকে আল্লাহর বিধান থেকে গাফিল করতে পারে না, বরং তার ঈমানের জযবা আরো বেড়ে যায়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

অর্থ: "যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন

তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে"। [সূরা আনফাল ৮:২]

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

অর্থ: "সে সমস্ত লোক, যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুজি

দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে"। [সূরা আনফাল ৮:৩]

أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

অর্থ: "তারাই হলো সত্যিকার ঈমানদার! তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রুজি"। [সূরা আনফাল ৮:৪]

এ সকল আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, যারা আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করবে, দ্বীনের প্রতি তাদের আগ্রহ প্রেরণা দিন দিন বাড়তেই থাকবে।

মুমিনরা আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত দল

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুমিনদের একমাত্র সাহায্যকারী এবং মুমিনরাই আল্লাহর সাহায্যের একমাত্র হকদার। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থ: "আপনার পূর্বে আমি রাসুলগণকে তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি। তাঁরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর যারা পাপী ছিল, তাদের আমি শাস্তি দিয়েছি। মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব"। [সূরা রূম ৩০:৪৭]

উক্ত আয়াতের শেষে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

অর্থ: "হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন"। [সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:৭]

এই আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহকে সাহায্য করলে আল্লাহও সাহায্য করবেন। আল্লাহকে সাহায্য করার অর্থ কি? আল্লাহকে সাহায্য করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করা। অর্থাৎ, আল্লাহর দ্বীন আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যারা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাবে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য করবেন এবং হকের উপর দৃঢ়পদ রাখবেন।

মুমিন তার লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে

বিশ্বনবী (স.)- "বলেছেন কোন পুরুষ কোন পুরুষের লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দিবে না এবং নারী কোন নারীর লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দিবেনা।" (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী,আহমদ)

লজ্জাস্থানের হেফাজত কেবলমাত্র প্রবৃ ত্তির বাসনা থেকে দূরে থাকা নয়, নিজের লজ্জাস্থানকে অন্যের সামনে উন্মক্ত করা থেকে দূরে থাকাও বুঝায়।হযরত জারহাদে আসলামি বর্ণনা করেছেন,একবার রাসূলুল্লাহ (স.) এর মজলিসে আমার রান খোলা অবস্থায় ছিল। নবী (স.) বললেন "তুমি কি জানো না রান ঢেকে রাখার জিনিস?" কেবল অন্যের সামনে নয় একান্তে উলঙ্গ থাকা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।রাসূল (স.) ইরশাদ করেন "সাবধান কখনো উলঙ্গ থেকো না।কারণ তোমাদের সাথে এমন সত্তা আছে যারা কখনো তোমাদের থেকে আলাদা হয় না (কল্যাণ ও রহমতের ফেরেশতা),তোমরা

যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দাও অথবা স্ত্রীদের কাছে যাও সে সময় ছাড়া।কাজেই তাদের থেকে লজ্জা করো,তাদের সম্মান করো ।”(তিরমিযী)

শরীয়তে পুরুষের মত নারীদের ব্যাপারে দৃষ্টি সংযমের বিধান বিদ্যামান রয়েছে।তারা পুরুষের মতোই ভিন্ন পুরুষদের দেখতে পারবে না। একদা হযরত উম্মে সালামাহ ও হযরত মাযইমুনাহ নবী (স.) এর কাছে বসা ছিলেন।এমন সময় হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম এসে গেলেন।তখন নবী (স.)উভয় স্ত্রীকে বললেন: তার থেকে পর্দা করো। স্ত্রীদ্বয় বললেন হে আল্লাহর রাসূল (স.)তিনি কি অন্ধ নন?তিনি তো আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না; রাসূল (স.) তখন বললেন : “তোমরা দুজনও কি অন্ধ?তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছো না”। (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

সুতরাং মুমিন নারী হোক অথবা পুরুষ হোক সে কোরআন ও হাদিসের ভাষ্যমতে পর্দা অবলম্বন করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ প্রসঙ্গে বলেন-

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

"(হে নবী)মমিন পুরুষদের বলে দাও তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করে।এটিই তাদের জন্য বেশি পবিত্র পদ্ধতি। যা কিছু তারা করে আল্লাহ তা জানেন। (হে নবী) মুমিন মহিলাদের বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে রাখা এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাজত করে আর তাদের সাজ-সজ্জা না দেখায়, যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় তা ছাড়া।আর তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল দিয়ে তাদের বুক ঢেকে রাখে।” (সূরা আন নূর : ৩০-৩১)

মুমিন কখনো নিরাশ ও হতাশ হয় না

একজন খাঁটি মুমিনের হৃদয়ে কখনো কোন হতাশা ও নিরাশা কাজ করবে না এবং বাসা বাঁধবে না। কোন দুঃখ বেদনায় সে ভেঙ্গে পড়বে না। কারণ হলো মুমিন বিশ্বাস করে- خَيْرِه وَشَرِّهُ مِنَ الله تَعالى (ভালো হোক মন্দ হোক সবই

আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত)। তার ভালো মন্দের চাবি কাঠি আল্লাহর হাতেই নিবন্ধ। পৃথিবীর কেউই তার কল্যাণ বা অকল্যাণ কোন কিছুই সাধন করতে পারবে না। মুমিনদের হৃদয়ে যখন কোন বিপদ-মুসিবত আসে, তখন তারা বিচলিত হয় না এবং হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে না বরং ধৈর্যের পরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বলে-

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن.َ

"(মুমিন লোকেরা এমন যে,) কোনো বিপদ যখন তাদেরকে বেষ্টন করে তখন তারা বলে, আমরা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই দিকে। ফিরে যাব।" (সূরা আল বাকারা: ১৫৬)

নমরুদ যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) কে আগুনে নিক্ষেপের সকল প্রস্তুতি শেষ করলো। ইবরাহীম (আ.) দেখতে পাচ্ছেন আগুনের কুণ্ডলি তাঁর জন্য প্রস্তুত করা হলো অত্যন্ত উত্তপ্তভাবে। চারদিকে সবাই প্রদক্ষিণ করতে প্রস্তুত। সবাই এ আনন্দ উৎসব উদযাপনে মানসিক সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করলো। ইবরাহীম (আ.) লক্ষ করলেন, নমরুদ তাঁকে এখনই আগুনে নিক্ষেপ করবে যার মধ্য দিয়ে নমরুদের দৃষ্টিতে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর একত্ববাদের কথা বলার মতো আর কেউই থাকবে না। একমাত্র তারই কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব কায়েম থাকবে। তার বিরুদ্ধে কথা বলার মতো কেউই থাকবে না। সে যা বলবে তাই প্রতিষ্ঠিত হবে, যেমনটি চিন্তা করেছিল দারুন নদওয়ার বৈঠকে- মুহাম্মদ (স.) কে শেষ করে দিতে পারলেই আমরা এবং আমাদের মূর্তিগুলো বেঁচে যাই।

এমনি মুহূর্তে ফেরেশতারা চলে আসলো ইবরাহীমের ধারে সাহায্য করার প্রত্যয়ে। ফেরেশতারা এসে বললো, হে ইবরাহীম আমাদের কাছে সাহায্য চাও আগুন থেকে বাঁচিয়ে দেই, পূর্ণ মুমিন হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন: হে ফেরেশতারা, তোমরা চলে যাও আর আমাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে দাও। আমিতো এমন আল্লাহর ইবাদত করি না যিনি আমার দুঃখ-দুর্দশা স্ব-চক্ষে দেখেন না। আমি আগুনে পুড়ে মারা গেলে যদি আমার আল্লাহ খুশি হন তাহলে আমার এমন আল্লাহকে খুশি করার জন্য হাজার বারও আগুনে পুড়তে রাজি আছি। অমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা আগুনের প্রতি নোটিশ জারি করে দিলেন-

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ.

"হে আগুন, আমার ইবরাহীমের প্রতি শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা হয়ে যাও।" (সূরা আল আম্বিয়া: ৬৯) আগুন আল্লাহর আদেশ মতে শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। কারণ আগুন তো

হলো সৃষ্টি আর আল্লাহ হলেন স্রষ্টা। তাই আগুন তো আল্লাহর কথাই শুনবে।

রাসূলের চাচা এবং তার স্ত্রী যখন জানতে পারলো তাদের পরিণতি সম্পর্কে সূরা এলাহাব অবতীর্ণ হয়েছে তখন সে পাথর খণ্ড নিয়ে আল্লাহর রাসূলকে আঘাত করার জন্য বসে থাকলো।

কিছুক্ষণ পর রাসূল (স.) আবু বকরকে সাথে নিয়ে কাবায় প্রবেশ করলেন। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আবু লাহাবের চোখ থেকে তাঁর রাসূলকে অদৃশ্য করে দিলেন। আবু লাহাব হযরত আবু বকর (রা.) কে জিজ্ঞেস করলো কোথায় মুহাম্মদ (স.)? আমি জানতে পারলাম সে আমার সম্পর্কে শাস্তির কথা বলছে। তাঁকে এখন কাছে পেলে এ পাথর দিয়ে আঘাত করতাম।

একথা বলে আবু লাহাব গর্বিত ভঙ্গিতে চলে গেলো। হযরত আবু বকর (রা.) রাসূল (স.) থেকে জানতে চাইলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আবু লাহাব আপনাকে দেখতে পেলো না কেন?

বিশ্বনবী (স.) উত্তর দিলেন: "হে আবু বকর! সে আমাকে দেখতে পায়নি। কেননা আল্লাহ তায়ালা তার চোখকে আদেশ দিয়েছিলেন, যেন সে আমাকে দেখতে না পায়।" (সুবহানাল্লাহ)

অর্থাৎ সৃষ্টি যার হুকুম চলবে তার। আল্লাহর সৃষ্টি আগুন নির্দেশ পেলো ইবরাহীমের প্রতি এয়ার কন্ডিশন হওয়ার জন্য আগুন দেরি করেনি। উত্তপ্ত আগুন এয়ার কন্ডিশনে পরিণত হয়ে গেলো।

হযরত ইবরাহীম (আ.) হতাশ হলেন না, নিরাশ হলেন না, বরং তিনি এক আল্লাহর ওপরই ভরসা করেছিলেন, যার ফলে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশে আগুনের কুণ্ড ফুল বাগানে পরিণত হয়ে যায়। এই জন্যই বিশ্বকবি আল্লামা ইকবাল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন-

'আজভি হো যো ইবরাহীম কা ইমা পয়দা,

আগকার ছাকতি হ্যায় এক আন্দাজে গুলিস্তা পয়দা।'

অর্থাৎ, ইবরাহীম (আ.) এর ন্যায় ঈমান যদি বর্তমানেও কারো ভেতরে বিদ্যমান থাকে, তাহলে তার জন্যও প্রজ্বলিত আগুন ফুলের বাগানে পরিণত হতে পারে। কেননা ইবরাহীমকে বাঁচিয়ে ছিলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সে আল্লাহ কর্তৃত্ব

সহকারে আজও বিদ্যমান রয়েছেন। মুমিন কখনো হতাশ হবে না নিরাশ হবে না। জীবনের সর্বশেষ পর্যন্তও মুমিন আল্লাহর ওপরই ভরসা করবে সে বিশ্বাস করবে তার কল্যাণ অকল্যাণের নির্ধারক
হলেন একমাত্র শুধুমাত্র, কেবলমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি যদি তাকে কোন ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত করে পরীক্ষা নিতে চান, তবুও সে হতাশ না হয়ে আল্লাহর উপরই ভরসা করবে। কেননা সে জানে আল্লাহই বলেছেন যে, তিনি মুমিনদের বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করবেন যা পবিত্র কুরআনে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِين.َ

"আর নিশ্চয়ই আমরা ভীতি, অনাহার, প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতির মাধ্যমে এবং উপার্জন ও আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে তোমাদের (মুমিনদের) পরীক্ষা করবো।" (সূরা আল বাকারা: ১৫৫)

উক্ত আয়াতের পরিপূর্ণ বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয় হযরত আয়ুব (আ.) এর জীবনে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী হযরত আয়ুব থেকে সকল দিক থেকে পরীক্ষা নিয়েছিলেন। আয়ুব (আ.) এর ধন-সম্পদ, ছেলে-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন সবকিছু তাঁর কাছ থেকে হারিয়ে গেলো। দেহ পঁচে গেলো-পোকা ধরলো। যার কারণে আল্লাহ ছাড়া তাঁর কাছে কেউই রইলো না। এরপরও তিনি সামান্যতম হতাশ হননি, নিরাশ হননি। বরং সর্বশেষ যখন তাঁর জিহ্বাতেও পোকা ধরলো তখন তিনি শুধু এতটুকুই বললেন- যা পরবর্তীতে মুমিনদের জন্য আল্লাহ তায়ালা কোরআনুল কারীমে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِين ۞.

"স্মরণ করো, যখন সে (আয়ুব) তার রবকে ডাকলো, আমি রোগগ্রস্ত হয়ে

গিয়েছি আর তুমি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাকারী।" (সূরা আল আম্বিয়া: ৮৩)

কঠিন এ মুহূর্তে হযরত আয়ুব (আ.) যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁর সে ভূমিকা সম্পর্কে মহান আরশে আযীমের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে যে সনদ দান করেছেন যা মুমিনদের জন্য অত্যন্ত শিক্ষণীয়। আল্লাহ বলেন-

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاب.۞

"আমি তাঁকে (আয়ুবকে) সবরকারী পেয়েছি, উত্তম বান্দা ছিল সে, সে নিজের রবের অভিমুখী।" (সূরা সা'দ: ৪৪)

এমনই হন আল্লাহর প্রিয় মুমিন বান্দাগণ! যখন বিপদের ও কঠিন সংকটের মুখোমুখি হন তখন তারা তাদের রবের কাছে অভিযোগ করবেন না বরং ধৈর্য সহকারে তাঁর চাপিয়ে দেয়া পরীক্ষাকে মেনে নেন এবং তাতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তাঁর কাছেই সাহায্য চান। কিছুকাল আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার পর যদি বিপদ অপসারিত না হয় তাহলে তার থেকে নিরাশ হয়ে অন্যদের দরবারে হাত পাতবেন, এমন পদ্ধতি তারা অবলম্বন করেন না। বরং, তারা ভালো করেই জানেন যা কিছু পাওয়ার আল্লাহর কাছ

থেকেই পাওয়া যায়। তাই বিপদের ধারা যতই দীর্ঘ হোক না কেন তাঁরা কেবল তারই করুণা প্রার্থী হন। এজন্য তারা এমন দান ও করুণা লাভে ধন্য হন যার দৃষ্টান্ত হযরত আয়ুবই (আ.) যথেষ্ট।

বিপদ-মুসিবত যতই কঠিন হোক না কেন মুমিন তা খুব সহজেই হজম করে চলে। সে কখনো মিথ্যার কাছে মাথা নত করে না। যেমনটি মাথা নত করেননি ইতিহাসের অন্যতম নির্যাতনের স্বীকার হযরত বিলাল (রা.)। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর মনিব উমাইয়া বিন খালাফ তাঁকে নানাভাবে নির্যাতন করতে লাগলো। দ্বিপ্রহরের ক্ষরতাপে অগ্নিস্নাত তপ্ত বালুকার উপর সে হযরত বিলালকে চিৎ করে শুয়ে দিয়ে তাঁর বুকের ওপর পাথর চাপা দিয়ে রাখত। উপরে প্রচণ্ড সূর্যোতাপ- নিচে আগুনের কয়লার মতো বালু। তার ওপর চাবুকের আঘাত। মাঝে মাঝে ঘোড়ার পায়ের সাথে বেঁধে ঘোড়াকে তাড়িয়ে দেয়া হতো। যার ফলে পুরো দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেতো। এই ধরনের নিষ্ঠুর অত্যাচারের উদ্দেশ্যই ছিল হয় তিনি মারা যাবেন, নতুবা অসহ্য হয়ে ইসলাম ত্যাগ করবেন।

কিন্তু আল্লাহর প্রিয় মুমিন বান্দা-মর্দে মুজাহিদ প্রিয় আল্লাহকে ভুলেননি বরং নিষ্ঠুর কাফেরেরা যখন মাঝে মধ্যে আঘাত বন্ধ করে বলতো বিলাল- এখন তোর আল্লাহকে ভুলে যা। মুহাম্মদ (স.) এর দ্বীন থেকে বেরিয়ে আয়। লাত-মানাতের

উপর ঈমান আন, তাহলেই কেবল মুক্তি, না হয় মৃত্যু। এমনি মুহূর্তে হযরত বিলাল (রা.) শাহাদাত আঙ্গুল উঁচু করে বলতে লাগলেন

أَحَدٌ. أَحَدٌ. لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله.

তেমনিভাবে নির্যাতন সহ্য করেছিলেন হযরত খাব্বাব (রা.)। তাঁর প্রতি কাফের বেঈমানদের অত্যাচারের অবধি ছিল না। লৌহ জেরা পরিয়ে তাঁকে আরবের মরুভূমির প্রচণ্ড রোদে শায়িত করে রাখা হতো। রোধের তাপে তাঁর শরীর থেকে বিগলিত ধারায় ঘর্ম নির্গত হতো। অধিকাংশ সময়ই তাঁকে উত্তপ্ত বালুতে শয়ন করে রাখা হতো।

উত্তাপে তাঁর কোমরের গোশত পর্যন্ত গলে যেত। যার ফলে হযরত খাব্বারের কোমরে অনেক বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়।

একদিন খলিফা ওমর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত খাব্বাব রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুকে তাঁর প্রতি ইসলাম বিরোধীদের নির্যাতন সম্পর্কে জানতে চাইলে হযরত খাব্বাব রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শন করলেন। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর কোমর দেখে বললেন আল্লাহর কসম! এমন কোমর তো আমি কখনো দেখিনি। হযরত খাব্বাব রাদিআল্লাহু তায়ালা

আনুহু বললেন- 'আমাকে আগুনের অঙ্গারে চেপে রাখা হতো। এরপর আমার রক্ত এবং চর্বি গলে আগুন নিভে যেতো।'

মুমিনরা কৃত ওয়াদার সংরক্ষণকারী

মুমিন তার কৃত ওয়াদা পালনে সর্বদা তৎপর থাকে। ওয়াদার খিলাফ করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য না। ওয়াদার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের সুস্পষ্ট নির্দেশনা হলো-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূরণ কর"। [সূরা মায়েদা ৫:১]

সূরা নাহলের ৯১নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

অর্থ: "আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহকে জামিন করেছ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন"। [সূরা নাহল ১৬:৯১] হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেন,

آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان رواه

البخاري ومسلم

অর্থ: "মুনাফিকের আলামত তিনটি: ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে; ২. যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে; ৩. তার নিকট কোন আমানত রাখা হলে তা খিয়ানত করে"। [বুখারী, মুসলিম]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত এক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

অর্থাৎ, "যার মধ্যে চারটি দোষ পাওয়া যায় সে খাঁটি মুনাফিক; ১. তার নিকট আমানত রাখা হলে তার খিয়ানত করে; ২. কথা বললে মিথ্যা বলে; ৩. ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে; ৪. ঝগড়ায় লিপ্ত হলে গালি-গালাজ করে"। [বুখারী- মুসলিম]

এই রেওয়ায়েতগুলো থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মুমিন কখনো ওয়াদা ভঙ্গকারী হতে পারে না বরং সে ওয়াদার পূর্ণ হেফাজত-কারী হয়।

একদিন এক সাহাবী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এক স্থানে দাঁড় করিয়ে বললেন আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি আসছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তার কথায় সায় দিলেন। এদিকে ঐ সাহাবী বাড়ি গিয়ে ভুলে

গেলেন এবং তিনদিন পর এসে দেখলেন আল্লাহর রাসূল ঠিকই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। এই তো ছিল মহা-মানবের অনুপম আখলাক। আর এটাই হলো মুমিন চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মুমিন সব কাজে সবরকারী

সবর কাকে বলে? সবর হলো; সকল পরিবর্তিত পরিবেশ পরিস্থিতিতে নিজের মন-মেজাজকে পরিবর্তন না করা বরং সর্বাবস্থায় এক সুস্থ যুক্তিসঙ্গত ন্যায় আচরণ করে চলাই সবর। সবর হলো মুমিনের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যের একটি, এটি মুমিনের কাজ কর্মকে মহান রবের নিকট আকর্ষণীয় করে তোলে। পাশাপাশি এই সবর তাকে পার্থিব জগত ও পরকালে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন করে। সবর সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا

অর্থ: "অতএব, আপনি উত্তম সবর করুন"। [সূরা মা'য়ারিজ ৭০:৫]

সূরা ইউনুসের ১০৯নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ
অর্থ: "আর তুমি চল সে অনুযায়ী যেমন নির্দেশ আসে তোমার প্রতি এবং সবর কর, যতক্ষণ না ফয়সালা করেন আল্লাহ। বস্তুতঃ তিনি হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী”। [সূরা ইউনুস ১০:১০৯]

সবর মানুষকে চারিত্রিক মজবুতি দানের পাশাপাশি মানুষের কৃত গুনাহ মাফ করে তাকে পরিশুদ্ধ শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত করে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حَزَنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إلا كفر الله بِهَا مِنْ خَطَايَاه

অর্থাৎ, "কোন মুসলিম ব্যক্তি মানসিক বা শারীরিক কষ্ট পেলে কোন শোক বা দুঃখ পেলে অথবা চিন্তাগ্রস্ত হলে সে যদি সবর করে তাহলে আল্লাহ প্রতিদান স্বরূপ তার সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। এমনকি যদি সামান্য একটি কাটাও পায়ে বিঁধে তাও তার গুনাহ মাফের কারণ হয়ে দাঁড়ায়"। [বুখারী মুসলিম]

অন্য হাদিসে বলা হয়েছে,

وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ

অর্থ: "যে ব্যক্তি সবরের চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে সবরের শক্তি প্রদান করবেন। আর সবর হতে অধিক উত্তম ও ব্যাপক কল্যাণকর বস্তু আর কিছুই কাউকে দান করা হয়নি"। [বুখারী মুসলিম]

দ্বীনের দাঈ ও মুজাহিদগণের কাফিরদের শত উৎপীড়ন নির্যাতন সহ্য করতে হয়। সেক্ষেত্রে ভেঙে পড়লে দ্বীনের মহান টার্গেট থেকে বিচ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি। তাই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মনোবল চাঙ্গা রাখার জন্য সবরের প্রতি উৎসাহিত করে ঘোষণা করেন,

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

অর্থ: "হে মুহাম্মদ সবরের সাথে কাজ করতে থাক, তোমার এই সবরের তাওফিক তো আল্লাহই দিয়েছেন, ওদের কার্যকলাপে তুমি দুঃখিত চিন্তিত হইয়ো না এবং তাদের ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশলের দরুন মন ভারাক্রান্ত করো না"। [সূরা নাহল ১৬:১২৭]

সূরা আনআমের ৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ

অর্থ: "আপনার পূর্ববর্তী অনেক পয়গম্বরকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তাঁরা এতে সবর করেছেন। তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছা পর্যন্ত তারা নির্যাতিত হয়েছেন। আল্লাহর-বানী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আপনার কাছে পয়গম্বরদের কিছু কাহিনী পৌঁছেছে"। [সূরা আন'আম ৬:৩৪]

উক্ত আয়াতের মর্ম হচ্ছে; হে মুহাম্মদ তোমার পূর্বেও অসংখ্য রাসূলদের অমান্য করা হয়েছে। কিন্তু এই অস্বীকৃতি ও যাবতীয় জ্বালাতন নির্যাতনের মোকাবিলায় তারা সবর অবলম্বন করেছেন। অবশেষে তাদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য এসে পৌঁছেছে। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মাঝে মাঝে তাঁর বান্দাদের বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন কে সত্যিকারে সবরকারী এবং এর মাধ্যমে বান্দাকে পরিশুদ্ধ করে তার সান্নিধ্য দান করেন।

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত এক হাদিসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মুমিন নর-নারীর ওপর সময় সময় বিপদ ও পরীক্ষা এসে থাকে কখনো সরাসরি তার ওপর বিপদ আসে, কখনো তার সন্তান মারা যায়, আবার কখনো বা তার ধন সম্পদ বিনষ্ট হয়। আর সে এ সকল মুসিবতে মারা যায়, আবার কখনো বা তার ধন সম্পদ বিনষ্ট হয়। আর সে এ সকল মুসিবতে সবর করার ফলে তার কলব পরিষ্কার হতে থাকে এবং পাপ মুক্ত হতে থাকে। অবশেষে সে নিষ্পাপ আমলনামা নিয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হয়"। [তিরমিজী]

মুমিন ব্যক্তি সকল প্রকার বিপদ-মুসিবতে, অভাব-অনটনে, দুঃখ-কষ্টে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই সবর করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন, আমীন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

عَجَبًا لأمر المؤمِنِ إِنَّ أَمْرَه كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وليس ذلك لأحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابتهُ سَرَّاءُ شَكَرَ
فكانتْ خَيْرًا لَهُ وإِنْ أَصَابتهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فكانتْ خَيْرًا لَهُ

অর্থাৎ, “মুমিনের সকল কাজ বিস্ময়কর, তার প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে, আর এই সৌভাগ্য মুমিন ছাড়া কেউই লাভ করতে পারে না। দুঃখ- কষ্টে নিমজ্জিত হলে সে সবর করে আর এটা হয় তার জন্য কল্যাণকর। সুখ শান্তি লাভ করলে সে শোকর আদায় করে আর এটাও তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে"। [মুসলিম]

এসকল আয়াত ও হাদিস থেকে বুঝা যায় সবরের অনেক ফজিলত ও মর্যাদা রয়েছে। অতএব ভাইয়েরা! আমাদেরকেও এই গুণটি অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে।

মুমিন হতাশাগ্রস্ত হয় না

দুনিয়ার এ জীবনে বিপদ আসেই। নানান সময় নানান দিক থেকে বিপদ এসে হামলে পড়ে আমাদের ওপর। অর্থসম্পদ সন্তানাদি সম্মান-মর্যাদা- আক্রান্ত হয় সবকিছুই। দুনিয়ার জীবনে এ বিপদের মুখে পড়ার কথা অবশ্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সুস্পষ্টভাবেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে-

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ، وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ، الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ، قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ.

আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব সামান্য ভয় ও ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফসলের কিছুটা ক্ষতি দিয়ে; আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও- যাদের ওপর কোনো মসিবত এলে বলে, ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’- নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর আর অবশ্যই আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব। -সূরা বাকারা (২) : ১৫৫-১৫৬

বোঝা গেল, বিপদ আসবেই। বিপদের মুহূর্তে কী করতে হবে সেই নির্দেশনাও দেয়া আছে এ আয়াতে। কিন্তু বিপদ যখন কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী হয়, তা কেটে যাওয়ার মতো কোনো স্বাভাবিক সম্ভাবনা যখন মানুষের সামনে থাকে না, তখন আঘাত হানে হতাশা। হতাশা তাকে আল্লাহর রহমতের কথা ভুলিয়ে দিতে চায়। আল্লাহর কুদরত থেকে তার দৃষ্টিকে সরিয়ে দিতে চায়। আল্লাহর সীমাহীন অনুগ্রহ এবং দয়াকে আড়াল করে দিতে চায়। অথচ পবিত্র কুরআনের ভাষ্য মতে- মুমিন কখনোই হতাশ হতে পারে না। কুরআনে বর্ণিত ঘটনা। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন বার্ধক্যে উপনীত, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একদল ফেরেশতা এসে তখন তাঁকে এক জ্ঞানী পুত্রের

সুসংবাদ শোনাল। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন- আমাকে তো বার্ধক্য পেয়ে বসেছে, এরপরও তোমরা আমাকে এ সুসংবাদ দিচ্ছ?! কীসের ভিত্তিতে তোমরা এ সুসংবাদ দিচ্ছ? ফেরেশতারা বলল, আমরা তো সত্য কথাই বলছি। আপনাকে সত্য সুসংবাদই দিচ্ছি। বার্ধক্য আপনাকে স্পর্শ করেছে করুক, এ বৃদ্ধ বয়সেই আপনার সন্তান হবে। আপনি নিরাশদের দলে যাবেন না। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাদের কথার জবাবে বললেন, পথভ্রষ্টরা ছাড়া আর কে আপন প্রতিপালকের রহমত থেকে নিরাশ হতে পারে? (সূরা হিজ্র, ৫৩-৫৬ নং আয়াত দ্রষ্টব্য)

আরেকজন নবীর আরেকটি ঘটনা। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সর্বাধিক প্রিয় সন্তান ছিলেন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম। কিন্তু তাঁর ভাইয়েরা বাবার এই আদরকে সহজে মেনে নিতে পারেনি, তাই কৌশলে তাঁকে একদিন বাবার কাছ থেকে নিয়ে গিয়ে কূপে ফেলে দিল। আল্লাহর অসীম কুদরতে কূপ থেকে উঠে এসে একদিন তিনি মিশরের ধনভা-ারের দায়িত্বশীল হলেন। আর যে ভাইয়েরা তাঁকে নিয়ে চক্রান্ত করেছিল, দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে তারা খাবার আনতে হাজির হলো তাঁর কাছে। এরপর এক কৌশলে তিনি তাঁর সহোদর বিনইয়ামীনকে নিজের সঙ্গে রেখে দিলেন। দুই ছেলে হারিয়ে বাবা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম অন্য ছেলেদের বললেন, (তরজমা) 'হে আমার ছেলেরা! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সন্ধান করো। তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহর রহমত থেকে তো কাফের ছাড়া অন্য কেউ নিরাশ হতে পারে না।' -সূরা ইউসুফ (১২) : ৮৭

এ দুই নবীর শেষ কথা- এক আল্লাহকে যারা বিশ্বাস করে, যারা মুমিন, যারা সঠিক পথের অনুসারী, তারা তো কিছুতেই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হতে পারে না। তাঁরা উভয়েই ছিলেন পার্থিব বিপদের শিকার। একজন সন্তানহীন অবস্থায় পুরো জীবন কাটিয়ে বার্ধক্যে পৌঁছে গেছেন, আরেকজন এক সন্তানের শোকেই যখন পাথর হওয়ার অবস্থা, তখন হারালেন আরেক সন্তান! তবুও তাঁরা আল্লাহর অসীম কুদরতের কাছে আশাবাদী ছিলেন। হতাশা তাদের স্পর্শ করতে পারেনি। পরিশেষে তাঁরা উভয়েই এই পৃথিবীতে থেকেই এর ফল ভোগ করে গেছেন।

মুমিনের শান এমনই হওয়া উচিত। যতকাল বেঁচে থাকবে, আল্লাহর রহমতের কাছে আশাবাদী হয়েই সে বেঁচে থাকবে। সাধ্যে যতটুকু কুলায়, চেষ্টা করে যাবে। একবারের

চেষ্টা ব্যর্থ হলে আবার করবে। বারবার করবে। কবি যেমনটি বলেছেন : 'পারিব না এ কথাটি বলিও না আর/ একবার না পারিলে দেখ শতবার।'

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম দুই সন্তান হারিয়ে চরম সংকটের মুহূর্তেও ছেলেদের বলছেন- তোমরা গিয়ে ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সন্ধান করো! অর্থাৎ তিনি নিজেও আশাবাদী, আশা পোষণ করছেন। অন্যদের মনেও আশার সঞ্চার করতে চাচ্ছেন।

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন, 'হাবরু হাযিহিল উম্মাহ'-এই উম্মতের বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি বলেছেন, 'সবচেয়ে বড় কবিরা গোনাহ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে শিঁক করা, আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া আর আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে পড়া। -মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস ১৯৭০১

বিপদে পড়লে মানুষ যে কীভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এর কিছু বর্ণনা পবিত্র কুরআনেও আছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَ اِذَاۤ اَنۡعَمۡنَا عَلَی الۡاِنۡسَانِ اَعۡرَضَ وَ نَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ کَانَ یَـُٔوۡسًا.

আমি মানুষকে যখন কোনো নিআমত দিই তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও পাশ কাটিয়ে যায়। আর যদি কোনো অনিষ্ট তাকে স্পর্শ করে তাহলে সে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়ে! -সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৮৩

নানা কারণেই মানুষ হতাশায় আক্রান্ত হতে পারে। বিপদে যদি কেউ ধৈর্যধারণ করতে না পারে তখন দেখা যায়- সামান্য সংকটেই সে ভেঙ্গে পড়ে। কখনো হতাশাগ্রস্তদের সঙ্গও আরেকজনকে হতাশ করে দেয়। আরবীতে প্রবাদ আছে-المرأ على دين خليله অর্থাৎ মানুষ তার বন্ধুর আদর্শই গ্রহণ করে থাকে। এটাই স্বাভাবিকতা। তাই কেউ যদি হতাশাগ্রস্তদের সঙ্গে ওঠাবসা করে, তাহলে এই হতাশায় একসময় সেও আক্রান্ত হবেই। কখনো আবার প্রত্যাশার পাহাড়ও মানুষকে হতাশ করে। নিজের জীবন নিয়ে কিংবা জীবনের কোনো দিক নিয়ে যখন কেউ নিজ সামর্থ্যরে বিবেচনা না করে অনেক উঁচু স্বপ্ন দেখতে থাকে, এর পরিণতিতেও সে হতাশাগ্রস্ত হতে পারে। একের পর এক যখন আশাভঙ্গ হতে থাকে, তখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে সে। আবার এমনও হয়- আকস্মিক কোনো বিপদ কাউকে এতটাই ঝাঁকুনি দেয়, যার ফলে সে আর মাথা সোজা করে সামনে এগিয়ে চলার হিম্মত করতে পারে না। পরিণামে কেবলই হতাশা।আছে- কে জানে? গায়ক হয়ে উঠছেন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। সন্ত্রাসী-ডাকাত, ইসলামের দুশমন, অমুসলিম ধর্মগুরু, মন্দির-গীর্জার প্রধান ব্যক্তি উঠে আসছেন ইসলামের আলোকিত

সীমানায়। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে কি দ্বীন-ধর্ম আর পরকাল নিয়ে হতাশ হওয়ার কোনো সুযোগ আছে? আল্লাহ তাআলার কী দ্ব্যর্থহীন আহ্বান-

قُلْ يٰعِبَادِیَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ، اِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

বলো, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেন। সন্দেহ নেই, তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু। -সূরা যুমার (৩৯) : ৫৩

একই কথা পার্থিব সংকট নিয়েও। এখানকার কোনো সংকটই স্থায়ী নয়। দুনিয়াই যেখানে ক্ষণস্থায়ী, সেখানে এসব সংকট স্থায়ী হবে কীভাবে? পবিত্র কুরআনের একটি ছোট সূরা ‘সূরা আলাম নাশরাহ’। এ সূরায় আল্লাহ তাআলার ওয়াদা-

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.

কষ্টের সঙ্গেই তো স্বস্তি আছে। অবশ্যই কষ্টের সঙ্গেই স্বস্তি আছে। -সূরা আলাম নাশরাহ (৯৪) : ৫-৬

আল্লাহ তাআলার এ ওয়াদা সর্বকালের জন্যেই সত্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাকের একটি বৈশিষ্ট্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ، ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللهِ، قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ.

বরং তিনি, যিনি অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং তিনি বিপদাপদ দূর করে দেন আর পৃথিবীতে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করেন। আল্লাহর সঙ্গে কি অন্য কোনো মাবুদ আছে? তোমরা খুব সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর। -সূরা নামল (২৭) : ৬২

তাই হতাশ নয়; মুমিন হবে আশাবাদী। আল্লাহর রহমতের আশায় থাকবে সে; নিরেট পার্থিব বিষয় নিয়েও, দ্বীনী ও পরকালীন বিষয়েও। সর্বশক্তিমান দয়ালু আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর প্রতি যার বিশ্বাস থাকবে অটুট, তার অবশ্য হতাশ হওয়ার সুযোগ কোথায়! এ বিশ্বাস হতাশাকে দূর করবেই।

তথ্যসূত্র:https://ahlehaqmedia.com/7340/

আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে মুমিনের ভাবনা

মুমিনের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক কেমন তা আল্লাহ স্বয়ং সূরা নাসে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি মানুষের রব, মানুষের বাদশাহ ও মানুষের ইলাহ। যে ঈমান আনে তার সাথেই আল্লাহর এ সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং মুমিন সচেতনভাবে এ সম্পর্ক অনুভব করে। এ তিন রকমের সম্পর্কের ব্যাপারে প্রশান্তচিত্ত মুমিনের ভাবনা নিম্নরূপ:

১. আল্লাহ আমার রব। রব মানে লালন-পালনকারী, রক্ষণা-বেক্ষণকারী ও যাবতীয় প্রয়োজন পূরণকারী। মায়ের পেটে

ভ্রূণ অবস্থায় থাকার সময় থেকে এ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আমাকে সবসময় লালন-পালন করে চলেছেন। জন্মের সাথে সাথে মায়ের বুকে আমার জন্য দুধের ব্যবস্থা করেছেন। মা আমার মুখে খাবার তুলে দেন বটে, কিন্তু আমার রব হজম করার ব্যবস্থা করেন। নিঃশ্বাস বন্ধ হলেই সব শেষ। প্রতিটি নিঃশ্বাস তাঁর দান। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে গেলেই মৃত্যু। প্রতি মুহূর্তে তিনিই আমার রব।

যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, তার রবও আল্লাহই। কিন্তু সে তা অনুভব করে না। তার সে চেতনাবোধ নেই। আমি তাঁর

প্রতি ঈমান এনেছি। 'দমে দমে তনু মনে' তাঁকে অনুভব করি। তাঁকে ভুলে যাওয়া মানে নিজের সত্তাকেই হারিয়ে ফেলা।

ওহীর মাধ্যমে তিনি নিজেকে সর্বপ্রথম রব হিসেবেই আমার নিকট পরিচয় দিয়েছেন। ওহীর প্রথম আয়াতই হলো:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ "তোমার সৃষ্টিকর্তা রবের নামে পড়।'

সূরা ফাতিহা প্রথম অবতীর্ণ পূর্ণ সূরা। এতেও রাব্বুল আলামীন হিসেবে পরিচয় দিলেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে যত দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন, তাতে তাঁকে রাব্বানা (আমাদের

রব) বলে সম্বোধন করার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূল (স) সুসংবাদ দিয়েছেন যে, বান্দাহ যখন নামাযে সিজদায় যায়, তখন সে আল্লাহর সবচেয়ে নিকটে পৌঁছে যায়। তখন বেশি করে মনিবের নিকট চাওয়ার সুযোগ নিতে হবে। সিজদায় তাসবীহ পড়ার সময় سبحان ربى الأعلى (আমার মহান রব পবিত্র) বলার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তিনি কি আমার একার রব? তিনি তো রাব্বুল আলামীন। আমার রব না বললে নৈকট্য বোধ হয় না। শিশু বলে, 'আমাল আম্মু' এটাই নৈকট্য প্রকাশের ভাষা।

মায়ের মমতার কথা মনে হলে মনের গভীরে দোলা লাগে। মাকে কি ভোলা যায়? মায়ের হৃদয়ে এ মমতা যিনি দিলেন, তার মায়া-মমতার কি সীমা আছে? হাদীস থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলার মনে যে রহম (দয়া) আছে এর ১০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র তিনি জীবজগতে বিলি করে দিয়েছেন। আমার সে মহান রবের কথা মনে হলে অনেক গভীর দোলা

অনুভব করা উচিত।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم . 'নিশ্চয়ই সাচ্চা মুমিন তারা, যাদের মন আল্লাহর কথা শুনলে কেঁপে ওঠে।' (সূরা আনফাল: ২)

এ আয়াতটি থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহর সাথে ভালোবাসার গভীরতার দরুন আল্লাহকে স্মরণ করার সময় মুমিনের মনে দোলা অনুভূত হয়। । সত্যিকার মুমিন আল্লাহকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُباً لِّلّٰهِ 'যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর জন্য তাদের মহব্বত অত্যন্ত বেশি।' (সূরা বাকারা: ১৬৫)

২. আল্লাহ আমার বাদশাহ। আমি তাঁর রাজ্যে বাস করি। এ রাজ্যের বাইরে যাওয়ার কোনো সাধ্য আমার নেই। এ রাজ্যে সুখ-শান্তি ভোগ করতে হলে আমার বাদশাহ যাতে আমার ওপর সন্তুষ্ট থাকেন, সে বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

তিনি অসন্তুষ্ট হন এমন কোনো কাজ আমি কখনো করতে পারি না। সুখ-শান্তি চায় না এমন কোনো মানুষ নেই। সবাই যে শান্তি চায়, তা কি পায়? কিভাবে চললে সুখ-শান্তি পাওয়া যায় সে

কথা আমার বাদশাহ বলে দিয়েছেন। সে কথা মেনে না চললে কেমন করে সুখ-শান্তি পাবে?

প্রত্যেকেই যাকিছু করে, নিজের মঙ্গলের নিয়তেই করে। নিজের অমঙ্গলের উদ্দেশ্যে কেউ কাজ করে না। এমনকি যে আত্মহত্যা করে, সে-ও নিজের মঙ্গল মনে করেই করে। নিজের মঙ্গলের সহীহ নিয়ত তার অবশ্যই আছে; কিন্তু সে কেবল হিসাবে ভুল করেছে। কিসে মঙ্গল তা সে জানে না। আমার বাদশাহ মঙ্গলের যে পথ দেখিয়েছেনদ্দ একমাত্র ঐ পথেই সুখ- শান্তি পাওয়া যায়।

৩. আল্লাহ আমার ইলাহ। ইলাহ মানে মাবুদ। আবদ মানে দাস। যাঁর দাস তিনিই মাবুদ। দাসের কাজ হলো মনিবের হুকুম পালন করা। মাবুদ মানে মনিব বা হুকুমকর্তা। হুকুমকর্তা আরো আছে; কিন্তু তারা প্রভু নয়। তাই ইলাহ মানে হুকুমকর্তা

প্রভু। ইলাহ শব্দের অর্থ পূর্ণ করতে হলে হুকুমকর্তা শব্দের আগে একমাত্র শব্দ বসাতে হবে। আল্লাহ আমার 'একমাত্র
হুকুমকর্তা প্রভু। لَا إِلَهَ اللهُ কালেমাতে আমি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছি যে, আমি শুধু তাঁর হুকুম মেনে চলব; তাঁর হুকুমের বিরোধী কারো হুকুম মানব না। আমি শুধু তাঁরই দাস। অন্য কারো দাসত্ব আমি করতে পারি না। জীবন দিয়ে হলেও এ নীতি মেনে চলব।

আমার উপর হুকুম করার অধিকার আমার মাবুদ যাদেরকে দিয়েছেন, তাদের হুকুম যদি তাঁর হুকুমের বিরোধী না হয় তাহলে অবশ্যই মানব। কারণ, আমার প্রভুই তা মানতে হুকুম করেছেন। তাঁর হুকুমের বিরোধী অন্য সবার হুকুম অমান্য করার নির্দেশ দিয়েছেন।

রাসূল (স)-এর সাথে মুমিনের গভীর মহব্বতের অনুভূতি

মুমিন অত্যন্ত আবেগের সাথে উপলব্ধি করে যে, আল্লাহর দীনের মহানিয়ামত রাসূল (স)-এর মাধ্যমেই এসেছে এবং তাঁর গোটা জীবনটাই ইসলামের বাস্তব জীবন্ত রূপ। তাঁর জীবনই আসল কুরআন। তাঁর আনুগত্যই আল্লাহর নৈকট্য লাভের একমাত্র উপায়। আল্লাহ তাকেই ভালোবাসেন, যে তাঁর রাসূল (স)-কে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুন্দরতম আদর্শ হিসেবে অনুকরণের চেষ্টা করে।

মুমিন রাসূল (স)-কে একজন মানুষ হিসেবেই বিশ্বাস করে; তাঁকে মানবসত্তার ঊর্ধ্বে কোনো অতিমানব মনে করে না; তবে অবশ্যই তাঁকে মহামানব, শ্রেষ্ঠ মানব, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও আল্লাহর বন্ধু মনে করে। তিনিই একমাত্র মানুষ, যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যাবশ্যক। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মুমিনের জীবনে যাকিছু করণীয়- সবই রাসূল থেকেই শিখতে হয়। তাঁর শিক্ষাই দুনিয়ার জীবনে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্যের জন্য তাঁর শিক্ষাই একমাত্র নির্ভুল, ভারসাম্যপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ।

মৃত্যুর পর কবরে যে কয়টি প্রশ্ন করা হবে, এর মধ্যে একটি হলো মুহাম্মদ (স)-কে রাসূল বলে জান কি না? হাশরের কঠিন ময়দানে হাউজে কাউছারের পানি তাঁর হাত থেকে পেতে হবে। তাঁর শাফা'আত পাওয়ার সৌভাগ্য হলেই মুক্তি পাওয়া সহজ হবে। এভাবে আখিরাতেও তিনি মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যক।

তাই মুমিন তাঁকে নিজের চেয়ে, পিতা-মাতা-সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে বেশি মহব্বত করে। তাঁর প্রতি দরূদ পেশ করার সময় গভীর অনুভূতিতে মুমিনের অন্তর সিক্ত হয়। মুমিন এ বিষয়ে সচেতন যে, এ মহব্বতের দাবি পূরণ করতে হলে প্রতি পদে পদে তাঁকে অনুসরণ করতে হবে। তা না হলে মহব্বতের সত্যিকার প্রমাণ হয় না।

শরীয়তের উপর অবিচলতা

ঈমান আনার পর আলল্লাহ পাকের পক্ষ হতে একজন মুমিনের উপর যত দায়িত্ব বর্তায়, তার মধ্যে একটি বড় দায়িত্ব হলো, পূর্ণ মানসিক শক্তি ও প্রশান্তির সঙ্গে দ্বীন ও শরীয়তের উপর অটল-অবিচল থাকা। সময় যত সঙ্গীন হোক, পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক, কোনো অবস্থাতেই দ্বীন ও শরীয়ত থেকে বিচ্যুত না হওয়া। এর নাম হলো 'ইস্তেকামাত'। আল্লাহ পাক এমন লোকের প্রশংসায় ইরশাদ করেন,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ◌
নিশ্চই যারা আন্তরিকভাবে স্বীকার করে, আল্লাহ আমাদের রব ও প্রতিপালক, অতঃপর এর দাবীর উপর অটল-অবিচল থাকে, তাদের নিকট একটি সময় ফেরেশতাদলের আগমন হবে। তারা বলবে, তোমরা শংকিত হয়ো না, দুঃখ করো না, বরং প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং প্রফুল্ল থাকো। দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় জীবনে আমরা তোমাদের সঙ্গী। আর তোমাদের কাংখিত ও প্রার্থিত সবকিছু তোমাদের জন্য জান্নাতে প্রস্তুত রয়েছে পরম দয়াল ও ক্ষমাশীল আল্লাহর পক্ষ হতে আতিথেয়তা স্বরূপ, যা চাবে যত চাবে তার সবই তোমাদের জন্য উপস্থিত থাকবে। সূরা হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩০-৩২

সুবহানাল্লাহ! শরীয়তের উপর অবিচল ব্যক্তিদের জন্য কত বড় সুসংবাদ! নিজের জানমাল সবকিছু কোরবান করেও যদি এই মর্তবা হাসিল করা যায়, তবে তাই হবে বড় সৌভাগ্যের বিষয়। হাদীস শরীফে এসেছে,

يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي أَسَامَةَ غَيْرَكَ - قَالَ: قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ، ◌

فَاسْتَقِمْ ◌

এক সাহাবী নবীজীর কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ উপদেশ দান করুন, যাতে আপনার পর আর কাউকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না হয়। নবীজী ইরশাদ করলেন, বলো, আমার রব আল্লাহ! এবার এই কথার দাবীর উপর অবিচল থাকো এবং তোমার বন্দেগী ও যিন্দেগী সেমতে গড়ে তোলো। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৮

আল্লাহ পাকের অনুগত বান্দারা বড় বড় প্রলোভন ও ভয় ভীতি উপেক্ষা করে দ্বীনের উপর অবিচল থাকেন। আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফে তাদের কিছু ঘটনা আমাদের হেদায়েতের জন্য উল্লেখ করেছেন। যেমন যাদুকরদের ঈমান আনার ঘটনা। ফেরআউন যাদেরকে মুসা আলাইহিস সালামের মোকাবেলার জন্য একত্রিত করেছিলো। তাদেরকে অনেক পুরস্কার ও সম্মানের ওয়াদা দিয়েছিল। কিন্তু যখন মুসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতের সত্যতা তাদের সামনে খুলে গেলো, তখন তারা ফেরআউনের বড় বড় পুরস্কার দু'পায়ে দলে তার কঠিন শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ বেপরোয়া হয়ে বলে উঠলো,

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى হারুন ও মুসা যে পালনকর্তার ইবাদতের দাওয়াত দেয়, আমরা তাঁর উপর ঈমান আনলাম। সূরা ত্বহা ২০/৭০

এরপর যখন ফেরআউন তাদেরকে কঠোর শাস্তির কথা শোনালো, বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে শূলিতে চড়ানোর হুমকি দিলো, তখন তারা ঈমানী সাহস নিয়ে ফেরআউনের মুখের উপর বলে দিলো,

قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا

তোমার যা ইচ্ছে হুকুম দিতে পারো। (আল্লাহ না করুন) তোমার হুকুম তো শুধু এই দুনিয়াতে বাস্তবায়িত হতে পারে। (যদি হয়, তাতেও কিছু আসে যায় না)

আমরা তো আমাদের প্রকৃত রবের উপর এই আশায় ঈমান এনেছি যে, পরকালে তিনি আমাদের গুনাহগুলি মাফ করে দেবেন। সূরা ত্বহা ২০/৭২-৭৩

খোদ ফেরআউনের স্ত্রীর ঘটনা আরও শিক্ষণীয়। ফেরআউন ছিলো মিশরের একচ্ছত্র অধিপতি! স্ত্রী আছিয়া ছিলো তার হৃদয়রাণী। এ-থেকেই আন্দাজ করা যায়, আছিয়া কত সুখ-সম্মান আর প্রতিপত্তির মালিক ছিলো! কিন্তু যখন মুসা আলাইহিস সালামের দাওয়াত তাঁর অন্তরে আলো দান করলো তখন তিনি নির্ভীক কণ্ঠে ঈমানের ঘোষণা দিয়ে দিলেন! একটুও বিচলিত হননি যে, পরিণামে তো রাজকীয় আরাম- আয়েশের এই জীবন তাকে ছেড়ে দিতে হবে। ফেরআউনের পাশবিক জুলুমনির্যাতনও তাকে সইতে হবে। অনন্তর এই মহিয়ষী নারী ফেরআউনের এমন সব নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করে ঈমানের উপর অবিচল ছিলেন, যা শুনলেও কলজে শুকিয়ে যায়। কোরআন শরীফে আললাহ পাক তাঁর ত্যাগ-তিতীক্ষাকে মুমিন নরনারীর জন্য আদর্শরূপে উল্লেখ করে ইরশাদ করেন,

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ

إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ

الظَّالِمِينَ

মুমিনদের জন্য ফেরআউনের স্ত্রী আছিয়ার ঘটনা আল্লাহ পাক উদাহরণরূপে উল্লেখ করছেন। (চরম নির্যাতনের সময়) তিনি শুধু এই দুআ করতেন যে, হে আমার প্রতিপালক আল্লাহ! জান্নাতে তোমার নিকটতম স্থানে আমার নিবাস বানিয়ে দাও। ফেরআউনের অনিষ্ট থেকে তুমি আমাকে হেফাজত করো, এই জালিম সম্প্রদায়ের জুলুম থেকে আমাকে তুমি মুক্তি দাও। সূরা তাহরীম ৬৬/১১

সুবহানাল্লাহ! কতবড় সৌভাগ্য! কত বড় মর্যাদা! পুরো উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য, হযরত আবু বকর থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মুমিন নরনারীর জন্য হযরত আছিয়ার এস্তেকামত ও দৃঢ়তাকে আল্লাহ পাক আদর্শ স্থির করেছেন!

একবার মক্কার জীবনের সাহাবায়ে কেরাম নবীজীর কাছে আরজ করলেন,

أَلا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا ؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِه

(হে আল্লাহর রাসুল! এই জালিমদের জুলুম সীমা ছাড়িয়ে গেছে।) এদের উপর বদ্দুআ করুন অভিশাপ করুন। নবীজী বলেন, আহা! তোমরা এত তাড়াতাড়ি ভয় পেয়ে যাচ্ছো, অধৈর্য হয়ে পড়ছো! আগের কালের হকপন্থীদের সঙ্গে তো এ পর্যন্ত হয়েছে যে, গর্ত করে তাতে ঈমানদারকে আবক্ষ গেড়ে ফেলা হতো। এরপর লোহার চিরুনি দিয়ে মস্তক দ্বিখ-িত করে ফেলা হতো। তাদের হাড় থেকে গোশত আলাদা করে ফেলা হতো। কিন্তু এমন পাশবিক জুলুম সত্ত্বেও তারা দ্বীন থেকে পিছু হটতো না, ধৈর্যহারা হতো না। সহীহ বোখারী, হাদীস নং ৩৬১২

আল্লাহ পাক ঐ সকল মর্দে মুমিনের হিম্মত ও ইস্তেকামতের সামান্য অংশ আমাদের মতো কমজোরদেরও দান করুন, যদি ত্যাগের কোনো মুহূর্ত সামনে আসে, তাহলে তাদের পদাংক অনুসরণ করার শক্তি নসীব করুন, আমীন।

https://ahlehaqmedia.com/7971-2/

কুরআনের সাথে মুমিনের সম্পর্ক

মুমিনের নিকট কুরআনের প্রতি প্রবল আকর্ষণের আসল কারণ এটাই যে, পৃথিবীতে কুরআনই একমাত্র রাব্বুল

আলামীনের বিশুদ্ধ বাণী। পূর্ববর্তী কোনো বাণীই সংরক্ষিত নেই। আরবী ভাষায় নাযিল হওয়া এ বাণী সামান্যও বিকৃত হয়েছে বলে প্রমাণ করার সাধ্য কারো নেই।

মুমিন যখন কুরআন তিলাওয়াত করে তখন অন্তরে শিহরণ জাগে যে আল্লাহর বাণী উচ্চারণের পরম সৌভাগ্য তার হয়েছে। এ কুরআন তার জন্যই নাযিল হয়েছে, তাকে সম্বোধন করেই কথা বলছে। মনে হয় যেন, আল্লাহ স্বয়ং তার সাথে কথা বলছেন।

আমার রব। বাদশাহ ও ইলাহ আমাকে সম্বোধন করে যে বাণী পাঠালেন তা জানার জন্য মুমিন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়। কুরআন বোঝা তার নেশায় পরিণত হয়। কুরআন বুঝতে পারলে মুমিন এমন তৃপ্তি বোধ করে, যার কোনো তুলনা নেই। রাসূলুল্লাহ

(স) স্বয়ং দু'আ করেছেন,

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ رَبِّعُ قَلْبِي وَنُورَ بَصْرِى وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي.

'কুরআন দ্বারা আমার কালবকে সজীব করো, কুরআনকে আমার চোখের আলো বানাও, আমার দুঃখ-বেদনা দূর করো এবং আমাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দাও।' এসব অর্জনের জন্য মুমিনকে ব্যাপকভাবে কুরআন চর্চা করতে হয়। এ চর্চা করা হলে আখিরাতে কুরআন আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে বলে হাদীসে আছে বিধায় কুরআন বোঝার উৎসাহ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

নামাযের সাথে মুমিনের সম্পর্ক

মুমিনের নিকট নামায সবচেয়ে প্রিয় আমল। স্নেহপরায়ণ রবের নৈকট্য লাভের জন্য নামায সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম। ঘুম থেকে ওঠার পর নামাযই মুমিনের প্রথম আমল। এর পূর্বে পেশাব-পায়খানা, ওযু-গোসল তো নামাযেরই প্রস্তুতি। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আল্লাহকে ভুলতে দেয় না। কুরআনে আছে اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِى 'আমাকে স্মরণ রাখার উদ্দেশ্যে নামায কায়েম কর।'

মুমিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে জামায়াতের সাথে আদায় করে। নামাযরত অবস্থায় আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকার বাইরে কিছুই করে না। নামায তাকে শিক্ষা দিল যে, নামাযের বাইরেও সব কাজ আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী করতে হবে। এ দেহটি দিয়ে যে কাজই করানো হয় ঐ নিয়মেই করাতে হবে। এভাবে চলার অভ্যাস করতে থাকলে নামাযে যে ট্রেনিং দেওয়া হয় তা বাস্তবে নামাযের বাইরেও চালু হবে। এভাবেই জীবনে নামায কায়েম হয়। মসজিদে নামায পড়া হয় মাত্র। কুরআনে

নামায কায়েম করতে হুকুম করা হয়েছে। দুই ওয়াক্তের মাঝখানে দুনিয়ার কাজ- কর্মে ব্যস্ত থাকাকালে নামাযের ট্রেনিং ঢিলা হয়ে যায়।

তাই বারবার নামাযে হাজির হয়ে ট্রেনিংকে ঝালাই করতে হয়। নামায বাইরের জীবন থেকে সম্পর্কহীন নয়। নামাযের প্রভাব যেমন নামাযের বাইরের জীবনে পড়ে, নামাযের বাইরের জীবনের প্রভাবও নামাযের উপর পড়ে। নামাযের বাইরে যদি এমন কিছু করা হয়, যা করা উচিত ছিল না, তাহলে এর প্রভাবে নামাযের সময় মনোযোগ নষ্ট হয় এবং শয়তান ঐসব কথা নামাযের মধ্যে স্মরণ করিয়ে দেয়।

মুমিন নামাযে যখন যা পড়ে ও করে তখন মনটাকে খালি থাকতে দেয় না। কখন মনে কী ভাবনা থাকা উচিত তা সে জেনে নেয় এবং নামাযের বাইরের ভাবনা মনে যাতে না আসে সে দিকে সতর্ক থাকে। শয়তান নামাযকে বিনষ্ট করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। সে মুমিনকে নামায থেকে তো কখনো ফিরিয়ে রাখতে পারে না; কিন্তু মনটাকে নামাযের বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় রত থাকে। কুচিন্তা তো মুমিন গ্রহণ করে না। তাই নামাযের বাইরের সুচিন্তা মনে ঢুকিয়ে হলেও নামাযকে ক্ষতিগ্রস্ত করার অপচেষ্টা চালায়। শয়তানের সরবরাহ করা সুচিন্তাও মুমিন গ্রহণ করে না। নামাযে শয়তানের সাথে মুমিনের যুদ্ধ সাময়িক নয়, স্থায়ী ও অবিরাম।

মুমিন ফজরের নামায শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় তার মনটাকে মসজিদে ঝুলিয়ে রেখে যায়। তাই বাইরে কর্মরত থাকাকালে যোহরের নামাযের খেয়াল হারায় না। এভাবে প্রত্যেক নামাযেই যথাসময়ে মসজিদে হাজির হতে সক্ষম হয়। হাশরের কঠিন দিনে যখন আল্লাহর রহমতের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না, তখন যারা ঐ ছায়ার নিচে আশ্রয় পাবে বলে রাসূল (স) ঘোষণা করেছেন, তাদের মধ্যে এমন নামাযীরাও থাকবে, যাদের মন মসজিদে ঝুলন্ত থাকে।

হাদীসে নামাযকে 'আল্লাহর সাথে গোপন আলাপ' বলা হয়েছে। মুমিন যখন নামাযরত থাকে, তখন সে যা কিছু বলে একমাত্র আল্লাহর সাথেই বলে, অন্য কারো সাথে নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে অবশ্যই বিরত রাখে।' কিন্তু সকল নামাযীর জীবনে কি এ কথা সত্য? আল্লাহর কথা তো অবশ্যই সত্য। তাহলে বুঝতে হবে যে, নামাযী হয়েও যারা অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে ফিরে থাকে না, তাদের নামাযে আসলেই ত্রুটি রয়েছে। তাদের নামায জীবন্ত নয়, মৃত। যাদের নামায জীবন্ত, তাদের নামায অবশ্য তাদেরকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম। কারণ, আল্লাহর কথা মিথ্যা হতে পারে না। এ বিষয়ে আমার লেখা 'জীবন্ত নামায' বইটিতে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

যার নামায জীবন্ত, সে নামাযের স্বাদ উপভোগ করে। তাই সে রুকূ'-সিজদা অত্যন্ত ধীরে ধীরে আদায় করে। নামাযে কোনো সময় তাড়াহুড়া করে না। রুকূ'র পর স্থির হয়ে দাঁড়ায়, হুট করে সিজদায় চলে যায় না। দুই সিজদার মাঝখানে স্থির হয়ে বসে হাদীসে শেখানো দু'আ পড়ার পর আবার সিজদায় যায়। অত্যন্ত ইতমিনানের সাথে মুমিন নামায আদায় করে।

পূর্ণ তৃপ্তির সাথে নামায আদায় করার জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে এত সময় পাওয়া যায় না। জামায়াতে নামাযের সময় তো ইমামের সাথেই নামায শেষ করতে হয়। মসজিদে অবশিষ্ট নামায বেশি সময় লাগিয়ে আদায় করলে অন্যরা দেখবে- এতে রিয়ার আশঙ্কা আছে। তাই মজা নিয়ে দীর্ঘ সময় নামাযে মহান মাবুদের সাথে গোপন সংলাপের জন্য শেষরাতে তাহাজ্জুদের নামাযই সেরা অবলম্বন।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, 'ফরয নামাযের পর সেরা নামায হলো শেষ রাতের নামায।' দু'আ কবুলের সেরা সময় হলো শেষ রাতের নামায।

একজন মুমিনের দৈনন্দিনের আমল

প্রথমেই সুবহে সাদিকের আগে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করবে।

,

হাদীস শরীফে এসেছেঃ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَه. " ُ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমাদের মহা মহীয়ান রবব প্রতি রাতের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে অবতরণ করে বলেন, আছে কেউ আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিবো? আছে কেউ আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করবো? আছে কি কেউ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো।

(বুখারী (অধ্যায় : তাহাজ্জুদ, অনুঃ রাতের শেষ ভাগে ও সলাতে দু‘আ করা, হাঃ **১১৪৫**), মুসলিম (অধ্যায় : মুসাফিরের সলাত, অনুঃ রাতের শেষাংশে দু‘আ যিকিরে উৎসাহ দান)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নামাজ হচ্ছে তাহাজ্জুদ নামাজ।’ (মুসলিম, হাদিস : **১১৬৩**)

ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে।

ফজর আর মাগরিব নামাজের পর সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করবে।

اللهم أجرني من النار সাত বার পাঠ করবে।

ফজরের পত সুরা ইয়াসিন পাঠ করবে।

মাগরিবের পর সুরা ওয়াকিয়া,ইশার পর সুরা মুলক,আলিফ লাম মিম সাজদাহ পাঠ করবে।

,

ফরজ নামাজের পর উক্ত আমল গুলো করবে।

,

কতটুকু কুরআন পড়তে হবে, এই ব্যাপারে বাধ্যতামূলক নিয়ম নেই।
সাধ্য অনুযায়ী বেশি বেশি তিলাওয়াত করার চেষ্টা করতে হবে।

,
তিন দিনের কম সময়ে কোরআন খতম করা অনুচিত। হাদিস শরিফে এসেছে, ‘তিন দিনের কম সময়ে যে কোরআন খতম করবে, সে কোরআন বুঝবে না।’ (আবু দাউদ, হাদিস : ১৩৯৬)

জায়েদ বিন সাবেত (রা.)-কে একজন জিজ্ঞেস করলেন, সাত দিনে কোরআন খতম করাকে আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখেন? তিনি বলেন, এটা ভালো। অবশ্য আমি এটাকে ১৫ দিনে বা ১০ দিনে খতম করাই পছন্দ করি। আমাকে জিজ্ঞেস করো, তা কেন? তিনি বলেন, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। জায়েদ বলেন, যাতে আমি তার স্থানে স্থানে চিন্তা করতে পারি এবং থামতে পারি।’ (মুয়াত্তা মালেক, হাদিস : ৪৭২)

https://ifatwa.info/21849/?show=21849&mibextid=NOb6eG#q21849

মুমিনদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য- সম্প্রীতি

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ . يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولِّيكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ، وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِينَ فِيهَا وَ مَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَ رِضْوَانٌ مِّنَ

اللهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

মুমিন নর ও মুমিন নারী পরস্পরে একে-অন্যের সহযোগী। তারা সৎকাজের আদেশ করে অসৎ কাজে বাধা দেয়, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তারা এমন লোক,

যাদের প্রতি আল্লাহ্ নিজ রহমত বর্ষণ
করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতারও মালিক, হিকমতেরও মালিক।

আল্লাহ মুমিন নর ও মুমিন নারীদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এমন উদ্যানরাজির, যার তলদেশে নহর বহমান থাকবে। তাতে তারা সর্বদা থাকবে এবং এমন উৎকৃষ্ট বাসস্থানের (প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন), যা সতত সজীব জান্নাতে থাকবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস (যা জান্নাতবাসীগণ লাভ করবে)। এটাই মহা সফলতা। -সূরা তাওবা (৯) : ৭১-৭২

মুমিনের সফলতা প্রার্থনা ও কৃতজ্ঞতা

মুমিন তো সে-ই, যে আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস করে। তাঁকে বিশ্বাস করে একক মাবুদ হিসেবে, একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসেবে। মুমিন মাত্রই বিশ্বাস করে, নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন ও শরীয়ত আমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন, তা যথার্থভাবে মেনে চলার মধ্যেই নিহিত আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের পরিপূর্ণ সফলতা। প্রকৃত মুমিন তো সে-ই, নিম্নোক্ত স্বীকারোক্তি যার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, আর কথায়-কাজে প্রতিফলিত হয়-

رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا.

আল্লাহকে রব ও প্রতিপালক, ইসলামকে দ্বীন আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে পেয়ে আমি খুশি।

মুমিনের আরেক স্বীকারোক্তি-

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين. ُ

আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি আর আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। -সূরা ফাতেহা (১): ৪

ইবাদত-বন্দেগীর এ স্বীকারোক্তি, আপদে- বিপদে সাহায্য প্রার্থনার এ স্বীকারোক্তি মুমিন প্রদান করে প্রতিনিয়ত। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পাশাপাশি সকল ওয়াজিব- সুন্নত-নফল নামাযের প্রতি রাকাতেই আমাদেরকে এ স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হয়। আমরা স্বীকার করি- আমাদের ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত, আমাদের সুখে-দুঃখে সকল চাওয়াও আমরা তাঁর দরবারেই নিবেদন করি। বিপদ থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা তাঁকে ছাড়া আর কার আছে? তিনি যদি না চান, তবে বিপদে ফেলার শক্তিও-বা আছে কার? সকল ক্ষমতার তিনিই উৎস, তিনিই মালিক। তাই সাহায্য চাইতে হলে তাঁর কাছেই চাইতে হয়। মুমিন-মাত্রই তাঁর কাছেই সাহায্যের জন্য হাত পাতে। দুনিয়ার যত ব্যবস্থাপনা, সবকিছু অবলম্বনের পরও মুমিন ব্যক্তির মনে থাকে একটিই আকুতি- আল্লাহ! একমাত্র আপনিই তো আমাকে সাহায্য করতে পারেন, এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন, আপনি আমাকে সাহায্য করুন, আমার চেষ্টা সফল করুন, আমার দুআ কবুল করুন!

যে শক্তির সামনে আমাদের এমন নিঃশর্ত সমর্পণ, সংকটে-সংগ্রামে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন বলে একমাত্র যাঁকে আমাদের বিশ্বাস, ইবাদত তো আমরা তাঁরই করব, তাঁর সামনেই তো আমরা সিজদায় লুটিয়ে পড়ব। মুমিনের উপলব্ধি তো এমন-

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِين.َ

নিশ্চয় আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার জীবন, আমার মরণ-সবই বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

জীবন-মরণের মালিক যিনি, মুমিন তার কাছেই জীবনের সকল ক্ষেত্রে সফলতা প্রার্থনা করে।সফলতার পর তাঁর দরবারেই কৃতজ্ঞতার সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। যে কোনো ব্যর্থতায় তাঁর রহমতের আশ্বাসবাণীতেই সান্ত¡না খুঁজে বেড়ায়। যার বিশ্বাস- আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার বাইরে গিয়ে জগতের সকলে মিলেও কেউ কারও কোনো বিন্দুমাত্র উপকার করতে পারে না, কাটতে পারে না তার গায়ে একটি কাঁটার আঁচরও, আল্লাহকে ছেড়ে সে কোথায় যাবে!কার কাছে যাবে! আল্লাহ তাআলাই তার একমাত্র ভরসা। প্রার্থনাও তাঁরই প্রাপ্য, কৃতজ্ঞতার অধিকারীও তিনিই।

কথা হল, জীবনে সফলতা লাভের জন্যে আমরা যে আল্লাহ তাআলার শরণাপন্ন হই, সফল হলে তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করি, সে সফলতার মানদণ্ড কী? মুমিনের সফলতা কোথায় নিহিত? সফল মুমিনের পরিচয় কী? একজন মুমিন হিসেবে এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের প্রত্যেকের জানতেই হবে।

আমরা বিশ্বাস করি- পরকালের সফলতা-ই একজন মুমিনের আসল সফলতা। দুদিনের এ দুনিয়ার জীবন সুখে-সাচ্ছন্দ্যে হোক, কষ্টে- দুঃখে হোক, কেটে তো যাবেই। এ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। দুনিয়ার জীবনও ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণস্থায়ী এখানকার সবকিছু। কিন্তু পরকাল যে অসীম, চিরস্থায়ী! সেখানকার সুখই আসল সুখ। সেখানেই পাওয়া যাবে অফুরন্ত নিআমত। আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী সচেতন মুমিন তাই নিজের পরকালটাকেই প্রথমে সাজাতে চায় সফলতার রঙে। সেখানে সফলতায় যারা ধন্য হবে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের শত কষ্ট নিয়েও তাদের কোনো ভাবনা থাকবে দুনিয়ার যত অপ্রাপ্তি, যত ব্যর্থতা, পরকালের

সফলতার পর এসব নিয়ে কারও মনেই কোনো আক্ষেপ থাকবে না, থাকবে না দুঃখের ছিটেফোঁটাও।

আমরা আরও বিশ্বাস করি- এ জীবনে আমাদের সামনে দুটি পথ খোলা। যে কেউ যে কোনো পথ ধরেই চলতে পারে। দুদিক থেকেই আসে আহ্বান। একটি ঈমান ও বিশ্বাসের পথ, মহান মালিকের সামনে নিজেকে সঁপে দেয়ার পথ এবং জীবন-জীবিকার সকল চাহিদা তাঁর বিধানের অনুগত করে দেয়ার পথ। আরেকটি কুফর ও অবিশ্বাসের

পথ, গোলাম হয়েও মনিবের সঙ্গে অবাধ্যতার পথ এবং আল্লাহর বিধানকে অগ্রাহ্য করে নিজের ইচ্ছেমতো জীবনযাপনের পথ। সংক্ষেপে বললে- একটি আল্লাহর পথ, আরেকটি শয়তানের পথ। এ তো বলাবাহুল্য, আল্লাহকে খুশি করতে চাইলে এবং পরকালের সুখ-সফলতা অর্জন করতে চাইলে আল্লাহর পথ ধরেই চলতে হবে। এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই।

শয়তান ওঁৎ পেতে আছেই- বনি আদমকে কীভাবে আল্লাহবিমুখ করবে। তার একমাত্র 'সাধনা'- আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর অবাধ্য করে দেয়া। এ অবাধ্যতার আবার নানা ধরন। সবচেয়ে বড় অবাধ্যতা-আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করা কিংবা তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করা। এ শরীক করা হতে পারে তাঁর একক সত্তা ও সৃষ্টিকর্তা হওয়ার ক্ষেত্রে, হতে পারে ইবাদতের উপযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রেও। এ কুফর-শিরকের অবাধ্যতায় যারা জড়িত, তাদের আমরা কাফের-মুশরিক বলি। তারা মুমিন নয়। কুফর ও শিরক ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

যারা কুফর-শিরকে জড়িত নয়, আল্লাহবিশ্বাসী মুমিন, শয়তানের প্ররোচনায় তারাও নানাভাবে আল্লাহ তাআলার বিধান লঙ্ঘন করে। নামায পড়া ফরজ জেনেও কেউ কেউ তা কাজা করে বসে। হজ করার মতো শারীরিক আর্থিক সকল সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর বিধান পালনে গড়িমসি করে। কোনো ওজর ছাড়াই রোযা ছেড়ে দেয়। জাকাত আদায় না করার নানা কায়দা-কৌশল খোঁজে। এভাবে ফরয ইবাদত আদায় না করা অন্যায়, পাপ। যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, যারা নিজেদেরকে আল্লাহ তাআলার অনুগত মুমিন বান্দা হিসেবে পরিচয় দেয়, শয়তান এসব অন্যায়ে জড়িয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে।

নামায-রোযা-হজ|-যাকাত-তিলাওয়াত-কুরবানী ইত্যাদি কিছু বিষয়কেই আমরা সাধারণত ইবাদত বলে বুঝে থাকি। কিন্তু একজন মুমিন বান্দার কর্তব্য এতটুকুতেই সীমিত নয়। তার স্বাভাবিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র- আচার- আচরণ, লেনদেন, কথাবার্তা, সামাজিকতা, পরিবার-ব্যবস্থাপনা- সবকিছুতেই মানতে হবে আল্লাহ তাআলার বিধান। ব্যক্তিগত জীবনেও নিজের ইচ্ছেমতো যে কোনো কিছু করার অধিকার তার নেই। আল্লাহর বিধানকে সামনে রেখেই তাকে নির্ণয় করতে হবে- এ জীবনে

চলার পথের প্রতিটি পদক্ষেপে তাকে কী করতে হবে, কী থেকে বিরত থাকতে হবে, নিজের ইচ্ছেগুলো কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পারবে আর কোন্ কোন্ ইচ্ছা থেকে সরে আসতে হবে। এ নির্ণয় যে যতটা বেশি করতে পারবে এবং সে অনুসারে পথ চলতে পারবে, সে ততটাই যথার্থ মুমিন, সফল মুমিন। মুমিন হিসেবে এ সফলতাই আমাদের পরম কাঙ্ক্ষিত।

এ এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা- নামায-রোযা আমরা যে যা-ই করি না কেন, লেনদেন-আচরণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে দ্বীনী বিধান পালনের ক্ষেত্রে আমরা চরম উদাসীনতার শিকার। বাহ্যত অনেক দ্বীনদার ব্যক্তিকেও দেখা যায় সুদের মতো গুরুতর পাপে জড়াতে। সুদভিত্তিক লেনদেন যে হারাম- এ তো কারও কাছেই অজানা নয়। অথচ পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথারীতি আদায় করেন এমন ব্যবসায়ীদের অনেকেই ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি করার জন্যে সুদি লোন গ্রহণ করেন। সুদি ব্যাংক-বীমার প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত অনেকেই নিয়মিত নামায

আদায় করেন। সেখানকার নারীদের অনেকে হিজাবও পরেন। তাদের অনেকেই নিজের কষ্টার্জিত টাকা দিয়ে হজ ও পালন করেন। যাকাতও দিয়ে থাকেন। অথচ মূল উপার্জনই যাদের হারাম, সে হারাম টাকা দিয়ে পালিত হজা-যাকাতের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু- তাকি আমরা ভেবে দেখেছি?

প্রশ্ন হল, তাদের জীবনে এমন সংঘাত কেন? ফরয বিধানও তারা পালন করে যাচ্ছেন নিয়মিত, আবার হারাম লেনদেনেও জড়িয়ে যাচ্ছেন অহরহ। এর কারণ হয়তো তাদের জানাই নেই, নামায-রোযার মতো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই একজন মুমিনকে পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হয় শরীয়তের বিধান। ফরয ইবাদতগুলো তো পালন করতেই হবে। এর পাশাপাশি জীবনে চলার জন্য যে জীবিকা আমরা উপার্জন করি, সেখানেও অনুসরণ করতে হবে শরীয়তের নির্দেশনা। ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক- জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানতে হবে ইসলামের বিধান।

জীবনধারণের প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহ তাআলার হুকুম আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহই হতে হবে আমাদের শেষ কথা। সফলতার কোনো উপলক্ষ যখন

আসে, শরীয়তের আলোকেই তা উদ্যাপন করতে হবে। যে কোনো প্রকার দুঃখ- কষ্ট আমাদের জীবনে আসুক, শোকের প্রকাশটাও হতে হবে শরীয়তের বিধান মেনে। এ বিধান মানতে হবে আনন্দ-বিনোদন- উৎসবজাতীয় ক্ষেত্রগুলোতেও। ইসলামের মতো একটি পরিপূর্ণ দ্বীন ও শরীয়তের অনুসারী হয়ে একজন মুমিন-মুসলমানের পক্ষে জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই।

সন্দেহ নেই, এ বিধান মানার মধ্যেই নিহিত আমাদের প্রকৃত সফলতা। এটাই আমাদের সফলতার মানদণ্ড। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের বিধান পালনে যে যতটা অগ্রগামী, বাস্তবে সে ততটাই সফল। সঙ্গতকারণেই আমরা যখন আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের সফলতা প্রার্থনা করি, কোনো প্রয়োজনে আমরা তাঁর দরবারে দুই হাত তুলে মুনাজাত করি কিংবা সিজদায় লুটিয়ে পড়ি, তখন সফলতার এ মানদ-কেই সামনে রাখতে হবে। এ সফলতাই চাইতে হবে। একজন মুমিনের জন্যে যা প্রকৃতপক্ষে কোনো সফলতাই নয়, যে কাজে তাকে জড়িয়ে দিতে পারলে শয়তান মেতে ওঠে উচ্ছ্বাসে, যেখানে লিপ্ত হয়ে পড়লে আল্লাহ তাআলার সামনে তাকে আসামী হিসেবে দাঁড়াতে হবে, সেসব কাজে সফল হওয়ার জন্যও কি মুমিন দুআ করতে পারে আল্লাহ তাআলার দরবারে? পারে না। দুআ যদি সঠিকভাবে সঠিক স্থানে করা হয়, তবে তা-ও একটি ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়। দুআর মাধ্যমে মানুষের আসল দাসত্ব ফুটে ওঠে। কিন্তু এ দুআ যদি হয় আল্লাহ তাআলার নাফরমানীতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য? শরীয়তের কোনো বিধান লঙ্ঘনে সফল হওয়ার জন্য? বোঝাই যায়, এটা কেবল একটি পাপ নয়, অনেক পাপের সমষ্টি। এক তো আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন, এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে আল্লাহর কাছেই তাঁর অবাধ্যতায় সাহায্য প্রার্থনা! আবার এ প্রার্থনাকে মনে করা হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা ও মুমিনের শান! তাই একবার দুআ করার আগে শতবার ভেবে নিতে হবে- আমার এ দুআ শরীয়তের কোনো বিধানকে অমান্য করে নয় তো?

দুআ যদি যথাস্থানে করা না হয়, তবে তা কতটা ভয়াবহ শাস্তি বয়ে আনতে পারে- এর একটি দৃষ্টান্ত পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে-

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَهُ ايْتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ الْغُوِين.َ

(হে রাসূল!) তাদেরকে সেই ব্যক্তির ঘটনা পড়ে শোনাও, যাকে আমি আমার নিদর্শনাবলি দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তা সম্পূর্ণ বর্জন করে। ফলে শয়তান তার পিছু নেয়। পরিণামে সে
পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। -সূরা আ'রাফ

(০৭): ১৭৫

এ আয়াতের তাফসীরে শাইখুল ইসলাম মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা. বা. লিখেছেন- আল্লাহ তাআলা যাকে ইলম ও ইবাদতের মহা সৌভাগ্য দান করেন, তার উচিত অন্যদের তুলনায় বেশি সাবধানতা ও তাকওয়া অবলম্বন করা। এরূপ ব্যক্তি যদি আল্লাহ তাআলার আয়াতের বিপরীতে নিজের অবৈধ কামনা-বাসনা পূরণের পেছনে পড়ে, তবে দুনিয়া ও আখেরাতে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। [তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন, সূরা আ'রাফ, টীকা ৯৮]

তাই দুআ করতে হবে খুবই ভেবেচিন্তে। মুমিন তো তার জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহর দরবারে দুআ করবে। সে আর যাবে কোথায়? দ্বীন পালনে, দুনিয়ার জীবনযাপনে যা কিছু তার প্রয়োজন, সবই আল্লাহর কাছে চাইবে। এ চাওয়াটাও ইবাদত। যে যত বেশি চায় আল্লাহ তার প্রতি ততই খুশি হন। কিন্তু চাইতে হবে আল্লাহর বিধান মেনে, আল্লাহর বিধানের অধীনে থেকে। আল্লাহ তাআলার বিধান লঙ্ঘনে সফল হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছেই দুআ করা- এ হঠকারিতা ছাড়া আর কী!

একই কথা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রেও। যে কোনো নিআমত পেলে কৃতজ্ঞতা আদায় করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। শোকর ও কৃতজ্ঞতা মুমিন কখনো আদায় করে মৌখিক কথায়, কখনো কৃতজ্ঞতা আদায় করতে গিয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে, কখনো নফল নামায আদায় করে। আবার বড় কোনো নিআমতে, আনন্দের কোনো উপলক্ষে অন্যদের জন্যে খাবারের আয়োজন করাও শোকর আদায়েরই ভিন্ন পদ্ধতি। মুমিন তো আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্যই অন্যদের আহার করায়। তা বড় ফযীলতপূর্ণ একটি আমল। তাই প্রভুর দরবারে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ অন্যদের খাওয়ানোও যেতে পারে। সাহাবায়ে কেরামের যুগেও এ রীতি ছিল। এমনকি বিয়ে-পরবর্তী যে ওলিমা আর সন্তান জন্মপরবর্তী আকীকার

আয়োজন, সে-ও তো শোকর ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশই। তবে কথা হল, যে সফলতায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে, তা হতে হবে মুমিনের প্রকৃত সফলতা। এ সফলতা দুনিয়া কেন্দ্রিকও হতে পারে, হতে পারে দ্বীনবিষয়ক। কারও যদি শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কোনো চাকরির ব্যবস্থা হয়, তবে সে খুশি হয়ে আপনজনদের মিষ্টি খাওয়াতেই পারে। এটাও এক প্রকার কৃতজ্ঞতা। কিন্তু যদি চাকরিটাই হারাম হয়, শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ হয়, এমন চাকরি পেয়ে তো মুমিন খুশি হতে পারে না। এটা তো প্রকৃতপক্ষে তার কোনো সফলতা নয়। এটা এক বড় ধরনের বিচ্যুতি, শরীয়তের বিধান থেকে বিচ্যুতি। এমন বিচ্যুতিতে সফলতা পেয়ে মুমিন খুশি হতে পারে না। ইসলাম যে গান-বাদ্য হারাম করেছে, সেগুলোতে খ্যাতি কুড়িয়ে কোনো মুমিন খুশি হতে পারে না। হারাম পদ্ধতির কোনো বিনোদনে এগিয়ে গিয়ে মুমিন খুশি

হতে পারে না। এসব তো আসলে সফলতা নয়, মুমিন হিসেবে এসব ব্যর্থতা। একেকটি হারাম কাজে জড়ানো মানেই আল্লাহর বান্দা হিসেবে এক ধাপ অবনমন, আর শয়তানকে খুশি করার পথে এক ধাপ অগ্রসরতা। সহজ কথা, শয়তান যেখানে খুশি হয়, মুমিন তা কামনা করতে পারে না, তা নিয়ে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পারে না।

শরীয়তে যা নিষিদ্ধ, এমন কোনো হারাম কাজে নিজে জড়িয়ে পড়লে ইস্তেগফার করতে হবে আল্লাহ তাআলার কাছে। ক্ষমা চাইতে হবে। আন্তরিকতার সঙ্গে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করার কথা দিয়েছেন। আর অন্য কাউকে হারাম কাজে জড়িত দেখলে তার জন্যে দুআ করতে হবে, যেন সে শরীয়তের বিধান মেনে চলতে পারে, হারাম কাজ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, সুযোগ পেলে তাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন হারাম পথ ছেড়ে শরীয়তের আলোঝলমল রাজপথে উঠে আসার দাওয়াতও দিতে হবে। কোনো হারাম কাজে সফল হয়ে

খুশি হওয়া, সফলতা প্রার্থনা করা, অন্য কারও হারাম কাজে সহযোগিতা করা, সমর্থন করা- এগুলো মুমিনের কাজ নয়।

মোটকথা, মুমিন পদে পদে সফলতা চাইবেই। সফলতার জন্য প্রয়োজন আল্লাহর কাছে বিনীত প্রার্থনা। আর সফলতার পর অনিবার্য শোকর ও কৃতজ্ঞতা। তবে এ সফলতার কামনা, এজন্য প্রার্থনা আর এর পরে কৃতজ্ঞতা- এসবই আল্লাহ তাআলার বান্দা হিসেবে আল্লাহর বিধান মেনে যথাস্থানেই করতে হবে। তাহলেই আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পথ প্রশস্ত করবে ভবিষ্যত সফলতার। আমার শোকর আদায় বাড়িয়ে দেবে আল্লাহ-প্রদত্ত নিআমত।

https://www.alkawsar.com/bn/article/3114/

মুমিনের জীবন জিহাদী জীবন

আল্লাহর ঘোষণাঃ

وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي

الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"আল্লাহর পথে জিহাদ কর, জিহাদের পরিপূর্ণ হক আদায় কর। তিনি তোমাদেরকে এই কাজের জন্যে বাছাই করেছেন, তোমাদের জন্যে দ্বীনের মধ্যে কোন জটিলতা সৃষ্টি করেননি।"-(সূরা আল হাজ্জ: ৭৮)

মু'মিন যতক্ষণ এই দায়িত্ব পালন করবে ততক্ষণই সে বা তারা। সত্যিকারের মু'মিন থাকবে। সে তো আল্লাহর সৈনিক। এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে বা অনীহা প্রকাশ করলে তাদেরকে আল্লাহ এই বিশেষ মর্যাদা থেকে তাদের বঞ্চিত করবেন, হটিয়ে দেবেন এবং অন্য কোন মানব গোষ্ঠীকে এ কাজের জন্যে বাছাই করবেন।

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

"যদি তোমরা এ দ্বীন ছেড়ে পেছনে চলে যাও তাহলে তোমাদের পরিবর্তে আল্লাহ অন্য কোন কওমকে এ দায়িত্বে নিয়োগ করবেন- তারা তোমাদের মত হবে না।" (সূরা মুহাম্মাদ: ৩৮)

الا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ، وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ

شَيْئًا ناط ء

"যদি তোমরা আল্লাহর পথে লড়াইয়ে বের না হও তাহলে আল্লাহ

তোমাদেরকে সরিয়ে দিয়ে অন্য কোন কওমকে এ দায়িত্ব অর্পণ করবেন,

তোমরা আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।"

-(সূরা আত তাওবা: ৩৯)

مَنْ يُرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهَ.

اذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِينَ ، يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لأَنَّ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَاللَّهُ

واسِعٌ عَلِيمٌ (المائدة(٥٤ :

"তোমাদের মধ্য থেকে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে (দ্বীন কায়েমের সংগ্রাম

থেকে সরে দাঁড়াবে) তাদের পরিবর্তে আল্লাহ অন্য কওমকে এ দায়িত্বে

নিয়োজিত করবেন। তাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন, তারাও আল্লাহকে

ভালবাসবে। তারা মু'মিনদের প্রতি হবে সদয় এবং কাফেরদের প্রতি হবে

কঠোর। সংগ্রাম করবে আল্লাহর পথে, কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদের পরোয়া

করবে না। এটা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ- তিনি যাকে চান তার প্রতি .. অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ তো অসীম জ্ঞানের অধিকারী।"

আমরা এ বিষয়ে আলোচনার আগে আল কুরআনের কিছু আয়াতের উপর একবার নজর বুলিয়ে নিতে চাই:

يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ اَدلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ، ذُلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে কি আখেরাতের কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে নাজাতের উপায় বলে দেব? ঈমান আনো আল্লাহ ও রাসূলদের প্রতি এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে মাল দিয়ে ও জান দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর যদি তোমরা সঠিক জ্ঞান লাভে সক্ষম

হও।"-(সূরা আস সফ: ১০-১১)
وجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ، هُوَ اجْتَبُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي

الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ "জিহাদের পরিপূর্ণ হক আদায় করে, আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর। তিনি তোমাদেরকে এ কাজের জন্যেই বাছাই করেছেন। তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের মধ্যে কোন অসাধ্য কিছু চাপিয়ে দেননি।" -(সূরা হজ্জঃ ৭৮)

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ نه

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَاتٌ وَمَسْجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ، إِنَّ

اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزُه (الحج(٣٩-٤٠ :

"যারা লড়াই করে, তাদেরকে তো এ জন্যেই অনুমতি দেয়া হয়েছে যে,

তারা অত্যাচারিত, আর আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করতে সক্ষম।

যারা কেবলমাত্র "আল্লাহ আমাদের রব' এই ঘোষণা দেবার কারণে

অন্যায়ভাবে বাড়ী-ঘর থেকে বহিষ্কৃত হচ্ছে। একের দ্বারা অপরকে দমনের

ব্যবস্থা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে করা না হতো তাহলে বিভিন্ন জাতির

ইবাদাতখানাসহ মসজিদসমূহ ধ্বংস হয়ে যেত। আল্লাহর বেশী বেশী

যিকিরের স্থানসমূহের ধ্বংস সাধন করা হতো। যারা আল্লাহকে সাহায্য

করবে আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। আল্লাহ নিশ্চয়ই

শক্তিধর ও পরাক্রম শক্তিশালী।"-(সূরা আল হাজ্জ: ৩৯-৪০)

الَّذِينَ إِنْ مُكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلوةَ وَأَتُوا الزَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوا عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِه

"তাদের যদি কোন দেশে ক্ষমতাসীন করি তাহলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাতের বিধান চালু করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে। সব কাজের চূড়ান্ত ফলাফল তো কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যে।" -(সূরা আল হাজ্জ: ৪১)

لا يَسْتَوِي الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجْهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ. وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ، وَفَضْلَ اللهُ الْمُجْهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ اَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً . ورَحْمَةً ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"যেসব মু'মিন ঘরে বসে থাকে, কোন ক্ষতির মুখোমুখি হয় না, তারা ঐসব লোকদের সমমর্যাদার অধিকারী হতে পারে না, যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে তাদের মাল দিয়ে এবং জান দিয়ে। এভাবে আল্লাহর পথে মাল ও জান দিয়ে যারা সংগ্রামী ভূমিকা পালন করছে, আল্লাহ তাদেরকে ঘরে বসে থাকা লোকদের চেয়ে অনেক উচ্চমর্যাদা দান করেছেন। অবশ্য সকল ঈমানদারদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুন্দর ওয়াদা আছে। তবে সংগ্রামীদেরকে আল্লাহ তা'আলা বসে থাকা লোকদের তুলনায় অনেক বড় পুরস্কার ও প্রতিদানে ভূষিত করবেন। তাদের জন্যে রয়েছে অনেক অনেক মর্যাদা তার মধ্যে মাগফেরাত ও রহমত অন্যতম। আল্লাহ তো অবশ্য

অবশ্যই ক্ষমতাশীল ও মেহেরবান।" (সূরা আন নিসা: ৯৫-৯৬)

يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قَلْتُمْ إلى الْأَرْضِ ، أَرَضِيتُم بِالْحَيُوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ، فَمَا مَتَاعُ الْحَيُوةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إلا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًاه

وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُه
"হে ঈমানদার লোকেরা। তোমাদের কি হলো যে, যখন তোমাদেরকে

আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে বলা হয় তখন তোমরা মাটি কামড়ে ধর। তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই খুশী থাকতে চাও? অথচ আখেরাতের তুলনায় এই দুনিয়ার জীবন কিছুই নয়। যদি আল্লাহর পথে বের না হও তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন। তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোন মানব গোষ্ঠীকে এ কাজে নিয়োগ করবেন। তোমরা তার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আল্লাহ তো সবকিছুর উপরই ক্ষমতাশীল।" -(সূরা আত তাওবা: ৩৮-৩৯)
وَقْتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ، فَإِنِ انْتَهَوا

فَلا عُنْوَانَ إِلَّا عَلَى الظّٰلِمِينَ۝

"ফেতনার পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখ। যদি তারা ক্ষান্ত দেয় তাহলে যালেমগণ ছাড়া আর কারো প্রতি কঠোর আচরণের অনুমতি নেই।"-(সূরা আল বাকারা: ১৯৩)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا

وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ، وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّلُكُمْ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ۝

لا تَعْلَمُونَ (البقرة(٢١٦ :

"তোমাদের প্রতি কেতাল ফরয করা হয়েছে। যদিও সেটা তোমাদের অপছন্দনীয়। তোমরা যাকিছু অপছন্দ কর তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হতে পারে। আবার তোমরা যাকিছু পছন্দ কর তা তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর হতে পারে। আল্লাহ জানেন তোমরা জান না।"

(সূরা আল বাকারা: ২১৬)-فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشْرُوْنَ الْحَيُوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ، وَمَنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْف نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَاتُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوَالْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ، وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ، وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيرًاهُ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانُ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ۝

ضَعِيفًا (النساء : ٧٦٧٤) "আল্লাহর পথে তাদেরই লড়াই করা উচিত যারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রি করেছে। যারা আল্লাহর পথে লড়াই করে অতপর মারা যায় বা বিজয়ী হয় তাদেরকে আমরা অতিসত্বর বিরাট পুরস্কার দান করব। তোমাদের কি হয়েছে যে, আল্লাহর পথে লড়াই করবে না। অথচ অসহায় মযলুম নারী-পুরুষ ও শিশুগণ আল্লাহর দরবারে আর্তচিৎকার করে এই ভাষায় ফরিয়াদ করছে যে, হে আমাদের রব। এই জনপদ থেকে আমাদের অন্যত্র সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা কর, কারণ, এ জনপদের শাসকগণ যালেম। তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে অভিভাবক বানিয়ে

দাও। তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে সাহায্যকারী পাঠাও। যারা ঈমানদার তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে। আর যারা কাফের তারা লড়াই করে খোদাদ্রোহী শক্তির পথে। শয়তানী শক্তির সহযোগীদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখ। অবশ্যই শয়তানের কলা-কৌশল দুর্বল।"

-(সূরা আন নিসা: ৭৪-৭৬)

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِينَ (البقرة(١٩٠ :

"যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তাদের প্রতিহত করার জন্যে তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই কর। সীমালংঘন কর না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পসন্দ করেন না।" (সূরা আল বাকারা: ১৯০)

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ . يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ لَن وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَيةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعَكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَ الثَّانِبُونَ الْعُبِدُونَ الْحَمِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّجِعُونَ السَّجِدُونَ الأمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرُ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ، وَبَشّرِ الْمُؤْمِنِينَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জান ও মাল বেহেশতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে, মারবে এবং মরবে। এ মর্মে আল্লাহর ওয়াদা সত্য অবধারিত, যার উল্লেখ আছে তাওরাতে, ইঞ্জিলে এবং কুরআনে। আর কে আছে আল্লাহ থেকে বেশী নির্ভরযোগ্য, ওয়াদা রক্ষাকারী। অতএব, তোমরা এহেন ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে শুভ সংবাদ গ্রহণ কর যে ক্রয়-বিক্রয় ইতিমধ্যেই তোমরা সম্পন্ন করেছ। আর এটাই হলো সবচেয়ে বড় ধরনের সফলতা। তারা তাওবা- কারী, ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, আল্লাহর পথে ভ্রমণকারী, আল্লাহর জন্যে রুকু'-সিজদাকারী, তারা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দানকারী, অসৎকাজে বাধাদানকারী, সর্বোপরি তাদের পরিচয় হলো তারা আল্লাহর দেয়া সীমারেখার হেফাজতকারী বা

পাহারাদার। এই মর্মে মু'মিনদেরকে শুভ সংবাদ জানিয়ে দাও।"-(আত তাওবা: ১১১-১১২)

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا

أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَاتِيَ

اللَّهُ بِأَمْرِهِ ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ (التوبة(٢٤) :

"বল (হে মুহাম্মাদ), যদি তোমাদের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই, স্ত্রী বা স্বামী এবং নিকটাত্মীয়-স্বজন তোমাদের নিকট আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা থেকে অধিকতর প্রিয় হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ কোন ফাসেক গোষ্ঠীকে পথ দেখান না।" (সূরা আত তাওবা: ২৪)

وَاعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوٌّ اللَّهِ وَعَدُوكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ، لَا تَعْلَمُونَهُمْ ، اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ، وَمَا تُنْفِقُونَ

مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَه
"তাদের মুকাবিলায় তোমরাও সাধ্যমত প্রস্তুতি গ্রহণ কর। সেই প্রস্তুতি

পর্বের মধ্যে অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে তোলাও অন্যতম। যার মাধ্যমে তোমাদের শত্রুদের ভীতিপ্রদর্শন করবে। এর বাইরেও এমন কিছু শক্তি রয়ে গেছে যাদেরকে তোমরা জান না, কিন্তু আল্লাহ জানেন। আল্লাহর এ পথে তোমরা যাকিছু খরচ করবে তোমরা তার প্রতিদান অবশ্য অবশ্যই পাবে- তোমাদের প্রতি সামান্যতম যুলুমও করা হবে না।"-(সূরা আল আনফালঃ ৬০)

আমরা এ পর্যন্ত ঈমান, ইবাদাত, আখলাক ও মুয়ামালাত প্রসঙ্গে যাকিছু আলোচনা করেছি, তা শুধু ওয়াজ ও নসিহতের জন্যে নয়, বরং বাস্তবে রূপ দেবার জন্যেই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমরা আদিষ্ট। এভাবে জমীনের সকল দিকে ও বিভাগে আল্লাহর

কিতাব আল কুরআনের আলোকে আল্লাহর হুকুম-আহকাম মানা এবং নাফরমানী বর্জন করার জন্যে একটা অনুকূল পরিবেশ অপরিহার্য, যে পরিবেশে আল্লাহর হুকুম মানা যায় এবং নাফরমানী থেকে বাঁচা যায়। সেই সাথে যাবতীয় অকল্যাণ দূর করে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। এই পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানো একান্তই অপরিহার্য, তারই নাম জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ।

জিহাদ মানেই যুদ্ধ নয়। যুদ্ধ জিহাদের একটি পর্যায় মাত্র। প্রকৃতপক্ষে জিহাদ অর্থ চূড়ান্ত ও প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো। কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে চূড়ান্ত প্রাণান্তকর সংগ্রাম সাধনাই জিহাদ। আর এই প্রাণান্তকর সংগ্রাম সাধনা আল্লাহর দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে পরিচালিত হলেই তা হয় জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। এই প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম সাধনার মধ্যে শামিল পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ দাওয়াত। দাওয়াতের বাস্তব নমুনা পেশের জন্যে আমল ও আখলাকের মাধ্যমে শাহাদাতে হকের দায়িত্ব পালন, বাতিলের পক্ষ থেকে বাধা প্রতিবন্ধকতা এলে সবর ও ইস্তেকামাতের সাথে তার মুকাবিলা করা, সে বাধা প্রতিবন্ধকতা যদি সংঘাত ও সংঘর্ষের রূপ নেয় তাহলে পিছপা না হয়ে সবর, হিকমত ও বলিষ্ঠতার সাথে সর্বোচ্চ কুরবানীর বিনিময়ে এ সত্যের চূড়ান্ত সাক্ষ্য দান করা। কুরআন এই পর্যায়টাকে কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ নামে অভিহিত করেছে। কুরআনের ঘোষণা:

وَقْتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ اللهِ.

"তাদের সাথে লড়াই কর সকল প্রকার ফেতনা দূর হয়ে আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ রূপে বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত।" -(সূরা আল বাকারা: ১৯৩)

এ লড়াই শসস্ত্র যুদ্ধ না হয়ে রাজনৈতিক লড়াইও হতে পারে, যার ফলশ্রুতিতে ফেতনা দূর হয়ে দ্বীন বিজয়ী হবে। আজকের দিনে এটাকে রাজনৈতিক লড়াই হিসেবে গ্রহণ করাই বাস্তবসম্মত এবং অধিকতর যুক্তিযুক্ত। এই পর্যায় অতিক্রম করলেই দ্বীন বিজয়ী হয়, কোন একটি জনপদে আল্লাহর আইন-কানুন ও হুকুম-আহকাম জারী করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ সুযোগ যারা পায় আল্লাহর নির্দেশের আলোকে তারা নিম্নোক্ত কাজ আঞ্জাম দেয়:

الَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلوةَ وَآتَوُ الزَّكُوةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ

وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

"ঐসব (ঈমানদার) লোকদেরকে যদি আমি কোন ভূখণ্ডে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করি তাহলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে বাধা দান করবে।"

উপরোক্ত কাজগুলোর মধ্যে শুধু কিতালের পর্যায়টিই এমন যা থেকে রুগ্ন, নারী ও বৃদ্ধ লোকদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। বাদবাকী সবগুলো কাজ সকলেই সকল অবস্থায় যার যার অবস্থানে থেকে আঞ্জাম দেবার জন্যে সকলেই আদিষ্ট। মু'মিনের পরিচয়ই হলো সে একজন 'দায়ী ইলাল্লাহ' (আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী) ও 'মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ' (আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী)। মু'মিনের জীবনকে তাই কোন অবস্থায় জিহাদী জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার সুযোগ নেই।

আল্লাহর প্রতি ঈমানের ঘোষণা দিয়ে প্রকৃতপক্ষে একজন মু'মিন জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহর কাছে তার জান ও মাল বিক্রিই করে থাকে। এভাবে আল্লাহর কাছে জান-মাল বিক্রিকারী ব্যক্তির ঈমানের অনিবার্য দাবী হলো আল্লাহর পথে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে জান ও মালের কুরবানীর জযবাসহ সংগ্রাম করা। এ ধরনের ঈমানদার লোকদের ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক দায়িত্ব হলো মানুষকে সৎপথের নির্দেশ দেয়া, অসৎ পথে বাধা দেয়া এবং আল্লাহর দেয়া সীমারেখা হেফাজত করা।

মোটকথা, মু'মিন আল্লাহর জমীনে আল্লাহর খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে আগত মানব জাতিকে এ দায়িত্ব পালনে সহায়তা দানের দায়িত্ব ও কর্তব্যে নিয়োজিত আল্লাহর সৈনিক। আল্লাহর পক্ষ থেকে, আল্লাহর দ্বীনের ভিত্তিতে গোটা মানব জাতিকে কল্যাণের পথ দেখানো, অকল্যাণের পথ থেকে ফিরানো- অন্য কথায় দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি লাভের পথ দেখানোই তাদের প্রধানতম কাজ।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ

عَلَيْكُم شَهِيدًا.

"এভাবে তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত রূপে গড়া হয়েছে। যাতে তোমরা সকল মানব জাতির জন্যে সত্যের সাক্ষ্যদাতা (অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়) হতে পার। আর তোমাদের জন্যে সত্যের সাক্ষ্যদাতা হলো আল্লাহর রাসূল।" (সূরা আল বাকারা: ১৪৩)

অর্থাৎ আমাদের জীবন-জিন্দেগীর সকল ক্ষেত্রে রাসূল (সা)-কেই যদি আমরা অনুসরণ করি, তাঁকেই আমরা আদর্শ হিসেবে মেনে চলি, তাহলে তার ফলশ্রুতিতে দুনিয়ার সকল মানুষ আমাদেরকে আদর্শ হিসেবে মেনে চলবে। এভাবে রাসূলের আদর্শের পতাকাবাহী হিসেবে মানব জাতিকে পথ দেখানো, মানুষের সমাজে সত্যিকারের মানবতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানোই আল্লাহর সৈনিক হিসেবে মুসলিম উম্মাহর একমাত্র মিশন। আল্লাহর রাসূলের সরাসরি গড়া লোকদের পরিচয় ছিল তারা রাতে দরবেশ এবং দিনে অশ্বারোহী যোদ্ধা।

আল্লাহ আবার মু'মিনদেরকে সেই জিহাদী জিন্দেগী ফিরে পাবার তাওফীক দিন। আমীন।

রেফারেন্স -

[মুমিনের গুণাবলী - মাওলানা আবুল হোসাইন]

['কিতাবুয যুহদ' গ্রন্থের অনুবাদ
মুমিনের পাথেয় - ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক]

[কুরআনের আলোকে মু'মিনের জীবন - মতিউর রহমান নিজামী]

[মুমিনের বৈশিষ্ট্য - মাওলানা সালেহ মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ]

[প্রশান্তচিত্ত মুমিনের ভাবনা - অধ্যাপক গোলাম আযম]

جزاكم الله خير